ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

শ্রী শ্রীসোনার-গৌরাঙ্গ।

(গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে মাসিক পত্র।)

নিয়ামক—ভারতের অদ্বিতীয় ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ-বংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন।

সম্পাদক—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম-এ, অধ্যাপক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন।

শ্রীপত্রিকার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৷৹ আনা। ভিঃ পিঃ তে ৩।৴৹

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রাদির মতে এই পত্রিকাখানি বৈষ্ণব-পত্রিকা-সমূহের শীর্ষস্থানীয়। কয়েকটী অভিমত নিম্নে দেওয়া হইল :—

পল্লীবাসী ;—* * * শ্রীশ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই অপূর্ব্ব মাসিক-পত্রিকাটী প্রকাশ করিতেছেন। * * * সোনার-গৌরাঙ্গ চমৎকার হইতেছে। প্রতি সংখ্যাই সুসিদ্ধান্তসঙ্গত সন্দর্ভ-সম্ভারে পরম প্রীতিপ্রদ।

আনন্দবাজার ;—আজকাল ভক্তি জগতে যে দারুণ বিপ্লব চলিতেছে, এই পত্রিকা খানা (সোনার-গৌরাঙ্গ) সে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। প্রভুপাদের মত ভক্তি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত খুব কমই দেখা যায়। যাঁহারা তাঁহার উপদেশে পত্রিকাখানি পরি-চালনা করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য। আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষালাভ করিলাম। আশাকরি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অবশ্যই এই পত্রিকা খানা প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

অমৃতবাজার (ইংরাজী)।—প্রবন্ধসমস্তই সুলিখিত। এখন যেরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে, পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিও যদি এইভাবে চলে, তাহা হইলে একটী বহুকালের অভাব দূর হইবে। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে এই পত্রিকা খানি অতি উৎকৃষ্ট। যাহাতে এই পত্রিকাখানি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, অবশ্য বৈষ্ণবদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। "এই পত্রিকা-খানি-প্রবন্ধ-গৌরবে বৈষ্ণব-পত্রিকা-সমূহের শীর্ষস্থানীয়। যে সকল সমস্যা-[illegible]ন্ধে পূর্ব্বে অনেকেরই সন্দেহ ছিল, এই পত্রিকায় তাহাদের অতি সুন্দর ও [illegible] মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান—শঙ্কর-প্রেস, কুমিল্লা ;

ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন ।
প্রণীত ।

মূল্য ১৹ আনা মাত্র ।

প্রকাশক—
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন।
গ্রাঃ চরহামুরা, পোঃ সাইস্তাগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

কুমিল্লা শঙ্কর-প্রেসে
শ্রীরজনীকান্ত নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব।

—:০:—
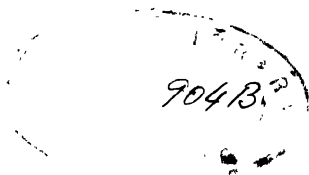
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠতম সাধন, এই বিষয় লইয়া চিরকাল হইতেই বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ বলিতেছেন, কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, এমন কি কর্ম্মই ভগবান্‌, স্বতন্ত্র ভাবে ভগবৎ-আরাধনার কোনই প্রয়োজন নাই, কারণ যিনি যেমন কর্ম্ম করেন, তিনি তদনুরূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্মই জীবের ভাগ্যবিধাতা, কর্ম্মই জীবকে সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ প্রদান করেন, ইত্যাদি।

এই প্রকার কেহ জ্ঞানের, কেহ বা অষ্টাঙ্গ * যোগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু উত্তমরূপে বিচার করিলে ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞানাদি স্বতন্ত্ররূপে কোনই ফল-প্রদানে সমর্থ নহে, ভক্তি কিন্তু স্বতন্ত্র, কাহারও কোনপ্রকার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই সর্ব্ববিধ ফল দান করিতে পারেন। এই অনন্য-নিরপেক্ষত্বই সর্ব্বপ্রকার সাধন হইতে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সাধ্য (স্বর্গ ও মুক্তি প্রভৃতি) ফলও কেবল ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে,

"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥"

* অষ্টাঙ্গ যোগ—"যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণাধ্যানসমাধয়োঽ-ষ্টাঙ্গানি। "যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি" যোগের এই আটটী অঙ্গ।

ভক্তি যে প্রকার জীবকে কৃতার্থ করেন, জ্ঞান ও যোগাদি সেরূপ করিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণ স্ব-মুখে ইহা বিশেষভাবে উদ্ধবকে বলিয়াছেন,

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা॥"

কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তপস্যাদি দ্বারা অতি কষ্টে যে ফল-লাভ ঘটে, ভক্তি-যোগে সেই সমস্ত অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে, গীতা-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা॥"

বস্ত্রহীন ব্যক্তি অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত হইলে, তাহা যেমন মাত্র দেহের বিরূপতাই সাধন করে, তেমনই ভক্তিহীন ব্যক্তির সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণাদি লজ্জার কারণই হইয়া থাকে,

"বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥"

পরমা মহতী ভক্তির অধীনত্ব জ্ঞান ও যোগাদির অবশ্যই আছে। কর্ম্ম-যোগে দেশ-কালাদির শুদ্ধ্যাশুদ্ধির অপেক্ষা কর্ম্ম-প্রতিপাদ্য স্মৃতিশাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তির পক্ষে কিন্তু সেরূপ কোন নিয়মই নাই। দেশকালাদি বিষয়ে ভক্তি কোন বিধি-ব্যবস্থারই অপেক্ষা রাখেন না। হেলায়ও একবার নাম করিলেই যথেষ্ট, শ্রদ্ধায় ভগবৎ-নাম করিলে আর কথা কি? নাম শুদ্ধই হউন, অশুদ্ধই হউন, নিশ্চয়ই জীবকে উদ্ধার করেন। শাস্ত্র, ভক্তির এই অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ম্ম-যোগে কিন্তু শুদ্ধাদির অভাবে মহান্ অনর্থ ঘটে। একটী মন্ত্র স্বরতঃ বা বর্ণতঃ হীন হইলে কর্ম্মতঃ বিফল হইবেই, অধিকন্তু অন্যবিধ ক্ষতিও অনিবার্য্য,

"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যো প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ স বাগবজ্রো যজমানং হিনস্তি॥"

দেবরাজ ইন্দ্র শত্রু বধের নিমিত্ত যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, স্বরহীনতার (উচ্চারণের) দোষে সেই যজ্ঞফলে নিজেই নিহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পরিশেষে অতি কষ্টে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ভগবৎ-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিতে যতদিন পর্য্যন্ত রুচি হয় না, ততদিনই কর্ম্ম-যোগের ব্যবস্থা শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

ভগবৎ-কথায় রুচি জন্মিলেই জীব ভক্তি আচরণ করেন। ভগবৎ-লীলা শ্রবণ করিতে করিতেই শ্রীভগবৎ-কথায় রুচি জন্মে, সুতরাং মঙ্গলপ্রার্থী জীবের সর্ব্বদাই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অবশ্য-কর্ত্তব্য।

পিত্ত-দুষ্ট রসনায় প্রথম মিশ্রির স্বাদ ভাল লাগে না, কিন্তু মিশ্রি ভক্ষণ করিতে করিতেই যেমন রসনার বিস্বাদ দূরীভূত হয়, তেমনই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিও প্রথমে প্রথমে ভাল না লাগিলেও চেষ্টা করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে হয়, এই প্রকারেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি জন্মে।

জ্ঞানে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা প্রসিদ্ধই আছে। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইলে, জ্ঞান-যোগে প্রবেশের অধিকার জন্মে। অতএব জ্ঞান-যোগের কর্ম্মাধীনত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আবার জ্ঞান-যোগীর যদি লেশমাত্রও আচারহীনতা ঘটে, তবে তিনি বান্তাশী (বমনভোজী) বলিয়া নিন্দনীয় হন, "স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ।"

কামাদি দোষ থাকা সত্বেও ভক্তিমার্গে প্রবেশের অধিকার আছে। ভক্তি দ্বারাই কামাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তিযোগের বিশেষত্ব, রিপু-দমনের পর ভক্তি লাভ নহে—ভক্তি-যাজনের আনুষঙ্গিক ফলেই রিপু দমন হইয়া থাকে। রিপু দমনের জন্য অন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রীভগবৎ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলে মুখ্যরূপে ভক্তিলাভ ঘটে, রিপু-দমন ইহার গৌণ ফল। ভক্তিতে বিনা প্রযত্নে অনায়াসে অত্যল্প কালের মধ্যেই রিপু দমন হইয়া থাকে,

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ,
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং,
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম-ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

বিবিধ দুঃখ-দাবানল-প্রপীড়িত জনগণের পক্ষে ভক্তিরস-নিষেবন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অতিশয় দুস্তর ভীষণ এই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম উপায়। শাস্ত্র ভক্তি-সাধনকে প্লব (ভেলা) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নৌকা ও অর্ণব-পোতাদির সমুদ্রে মগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকিলেও ভেলা যেমন কখনও জল-মগ্ন হয় না, উত্তাল তরঙ্গের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া নির্ব্বিঘ্নে তীরে উপনীত হয়, সেইরূপ কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সাধনে বিঘ্নের পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও ভক্তি সাধনে কিঞ্চিন্মাত্রও সম্ভাবনা নাই। ভক্তি-সাধক সর্ব্ববিধ বিঘ্নকে সোপান করিয়া তাহার মস্তকে পদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অপার ভব-সাগর গোষ্পদের মত অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। বিপদ তাঁহাকে কখনই অভিভূত করিতে পারে না। কৃষ্ণ-ভক্ত সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অতীত, তিনি সর্ব্বদা আনন্দময়। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই মধুর হাস্য লাগিয়া থাকেই।

"ভক্তিযোগে দুরাচার ভক্তেরও নিন্দা নাই, শাস্ত্র বরং তাঁহাকে পরম সাধুরূপেই নিরূপণ করেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

নিতান্ত দুরাচার ভক্তেরও যখন এই প্রকার সমাদর দেখা যায়, তখন প্রকৃত আচারবান্ ভক্তের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বর্ণনার ভাষা নাই, বলা বাহুল্য।"

অজামিলের মত একান্ত দুরাচার ভক্তকেও বিষ্ণুদূতেরা সাধু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপাপী অজামিল ভক্তির আশ্রয় মাত্রেই বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির চিত্ত-শুদ্ধির অপেক্ষা থাকায়, চিত্ত-শুদ্ধিকে জ্ঞান ও যোগাদির সাধক বলা যায়, সুতরাং জ্ঞান-যোগাদির সর্ব্বপ্রকারেই পারতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হয়। ভক্তি কিন্তু সর্ব্বথা স্বতন্ত্র।

কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি সাধনে দেশ, কাল পাত্র ও অবস্থা এই চারিটীর বিশেষ বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ সুপবিত্র স্থানে, বসন্তাদি উত্তম সময়ে, যজ্ঞাদি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিবে। শূদ্রাদি অন্য বর্ণ যজ্ঞাদি করিতে পারিবে না, আবার ব্রাহ্মণ হইলেও অপবিত্র দেশে, অকালে ও ব্যাধিগ্রস্ত দেহে যজ্ঞাদি করিতে পারিবে না—এইরূপ বিচার কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বদেশে সকল বর্ণের কর্ম্ম জ্ঞানাদি সমান ভাবে অনুষ্ঠেয় নহে, ইহা তত্তৎ-শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

একমাত্র ভক্তি-সাধনে এই সমস্তের কোনই প্রয়োজন নাই। ভক্তি-সাধন কোন বিচার বিবেচনার অপেক্ষা রাখেন না, সকলেই ভক্তি-সাধনে সমান অধিকারী, শাস্ত্র ইহা জলদ-গম্ভীর স্বরে বর্ণনা করিয়াছেন

"সর্ব্বজন, দেশ, কাল, দশাতে ব্যাপ্তি যার।
ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার॥
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার॥
সর্ব্বদেশ, কাল, দশায়, জনের কর্ত্তব্য।
গুরু পাশে এই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥

শাস্ত্র, ভক্তি-সাধনকে ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধুনা কথিত সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম এই সনাতন ভাগবত ধর্ম্মের একাংশের ছায়া মাত্র। ভাগবত ধর্ম্মের "ভগবৎ সাধনে সকলেরই সমান অধিকার, মাত্র এই মহাবাক্যের সঙ্গে ইহার ঐক্য আছে। বলা বাহুল্য, ভাগবত-ধর্ম্মে ভক্তি-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম, উহার সর্ব্বোত্তম উপাদেয়তা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় আস্বাদনের রহিয়াছে। ভাগবত ধর্ম্ম কোন্ সাধনে জীবের কি প্রাপ্য অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির তারতম্য সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়া ধর্ম্ম-জগতের বৃথা কলহ দূর করিয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ কিছুই অস্বীকার করেন নাই, সমস্তই মানিয়া যে সাধনে যাহা লাভ হয়, সাধ্য-বস্তু লাভের উপায় ও প্রাপ্তি-ভেদে যে আনন্দ-লাভের তারতম্য তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শাস্ত্র বলেন, একই ঈশ্বর সাধনানুরূপ সাধকের নিকট বহুবিধরূপে প্রকাশিত হন। একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন ভিন্ন ভিন্ন গুণ উপলব্ধ

হয়, ভগবানও তেমনই বিভিন্ন সাধকের চক্ষে সাধনাভেদে নানা প্রকারে প্রকাশিত হন।

"দুগ্ধের" রূপ দর্শন করিতে চক্ষুর, স্বাদগ্রহণে জিহ্বার প্রয়োজন হয়, কিন্তু চিত্ত যেমন উহার (দুগ্ধের) রূপ ও রসাদি গ্রহণ করিতে পারে, তেমনই কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি দ্বারা শ্রীভগবৎ-তত্ত্বের কিয়দংশ অবশ্যই অবগত হওয়া যায়, কিন্তু সম্যক্‌রূপে ভগবৎ-তত্ত্বের অনুভব, শ্রীভগবানের প্রেমসেবা-লাভ ভক্তি ভিন্ন হয় না।

ভক্তিযোগের অসাধারণ প্রভাবে দুরাচার ভক্তও অতি সত্বরই ধর্ম্মাত্মা হইয়া থাকেন। এই বিষয় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ঢাক ঢোল বাজাইয়া প্রতিজ্ঞা করিতে বলিয়াছেন,

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানিহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

ভক্তের প্রতিজ্ঞার মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেই নিজ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্যের সুমধুর পরিচয়ই সকলে জানিতে পারিয়াছেন। ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবান্ ভক্তের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ মায়া-যন্ত্রে যেমন জীব-জগৎকে ভ্রমণ করান, ভক্তও তাঁহাকে তেমনই প্রেমযন্ত্রে নাচাইয়া থাকেন। এই দৃশ্যটী বড়ই মধুর, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেম এই তিনই একত্র নৃত্য করেন,

"কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচায়।
আপনি নাচয়ে, তিনে নাচে এক ঠাঁই॥"

এখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্ত হইতেও প্রেমেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে। প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্ত উভয়ের উপরই আপন অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। এই প্রেমের বশীভূত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ বিদুর-পত্নীর অর্দ্ধ-পক্ক কদলির ছোলা ভক্ষণ করিয়াছেন। প্রিয় সখা শ্রীদাম-বিপ্রের তুষ-মিশ্রিত ছাতু ভক্ষণ করিয়া স্বীয় অসাধারণ করুণার সীমা জগৎবাসীকে দেখাইয়াছেন। ব্রজগোপীর নবনীত-হরণও এই প্রেম-পিরীতেরই ফল। প্রেম-কাঙ্গাল শ্রীনন্দ-দুলালের এই অপূর্ব্ব প্রেম-বৎসলতার কথা শাস্ত্র অশেষ প্রকারে বর্ণনা

করিয়াছেন। এই মধুর প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন বস্তুর প্রতিই সামান্য মাত্রও আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি আত্মারাম ও আত্মকাম হইয়াও প্রেমের কামনা করিয়া থাকেন। প্রেম-মোহিত শ্রীভগবানের এই অপূর্ব্ব প্রেম-লালসা দেখিয়া সকলেই মোহিত হন। প্রেম-দ্বারাই ভক্ত তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইতে পারেন। এই প্রেমবশ্যতা শ্রীভগবানের দূষণ নহে, পরন্তু পরম ভূষণই বটে। প্রেমময় হরি, সর্ব্বদাই প্রেমের ভিখারী। তিনি ভক্তগণকে আপনাকে পর্য্যন্তও দান করেন। শ্রীভগবানের এই ভক্তিবশ্যতার তুলনা জগতে দ্বিতীয় নাই।

জ্ঞান-সাধ্য যে মুক্তি তাহা হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ সর্ব্বত্রই দেখা যায়, "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্" প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্যেই এই বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

ভক্তিহীন মনুষ্যকে মনুষ্যই বলা যায় না, প্রকৃত বলিতে গেলে নরপশু বলিতে হয়,

"কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম"

এই সমস্ত বাক্যই এই বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ।

মনুষ্য ও পশুর মধ্যে মাত্র এই প্রভেদ,—মনুষ্য ভগবৎ-ভক্তি যাজন করে, পশ্বাদি তাহা করিতে পারে না। ভগবৎ-ভক্তিহীন মনুষ্য নিশ্চয়ই পশুর সমান।

ভক্তি-ধর্ম্মে সকলেই সমান অধিকারী, অনধিকারী বিচার ইহাতে নাই,

"শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী॥"

ভক্তি-ধর্ম্ম জাতিকুলের অপেক্ষা রাখে না। ভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও ঋষি-শ্রেষ্ঠ, ইহার অভাবে ঋষিও চণ্ডাল হইতে একান্ত নিকৃষ্ট,

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ-ভজে।
বিপ্র নহে বিপ্র, রৌরবে পড়ি মজে॥
সর্ব্ববর্ণে যেই ভজে, সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে, সে চণ্ডাল, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী হইতে যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়া পর-শ্লোকে ভক্তের উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন,

"তপস্বিভ্যোঽপ্যধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

ভক্তি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ, কিছুরই, তিনি অপেক্ষা রাখেন না। এইজন্য ভক্তিকে শাস্ত্র স্বপ্রকাশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জীবের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে ভক্তির প্রকাশ তাঁহার (শ্রীভগবানের) ইচ্ছায়ই হয়। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণাদি যেমন স্বেচ্ছায় জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য অবতীর্ণ হন, ভক্তিও তেমনই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ যেমন স্বপ্রকাশ বলিয়া জীবের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে আবির্ভূত হন, তদীয় ভক্তিও তেমনই বিনা কারণে স্বেচ্ছায় যেখানে সেখানে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এইজন্য শাস্ত্র ভক্তিকে "অহৈতুকী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অহৈতুকী-শব্দে ভক্তির কারণ-নিরপেক্ষত্ব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

কেহ কেহ ভক্তিলাভের কারণ কোন প্রকার সৌভাগ্য—এইরূপ বলিয়া থাকেন। এইপ্রকার ব্যাখ্যা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ভাগ্য-শব্দের "শুভ-কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট" এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, শুভ-কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ভক্তির কর্ম্ম-পরতন্ত্রতা হেতু স্বপ্রকাশতার হানি ঘটে।

কেহ কেহ শ্রীভগবৎ-কৃপাকে ভক্তি-লাভের কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন, এইরূপ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। তাহা হইলে শ্রীভগবানের বৈষম্য দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানের কৃপা সর্ব্বত্র দেখা যায় না বলিয়া তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়।

ভক্তি-লাভের কারণ নির্ণয় করা সুকঠিন হইলেও শাস্ত্র তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, উত্তমরূপে বিচার করিলে ভক্ত-কৃপাই ভক্তি-লাভের কারণ, ইহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। এখানেও সাধারণ দৃষ্টিতে ভক্ত-চরিত্রে বৈষম্য আপতিত হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ ভাবে বিচার করিলে বুঝা যায়, মধ্যম ভক্তে এই প্রকার বৈষম্য আছে। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি কৃপা ও ভক্তদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনিই মধ্যম ভক্ত। শাস্ত্র বলেন,

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

সাধুসঙ্গই ভক্তি লাভের কারণ,

"কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মূল হয় সাধু-সঙ্গ।"

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশেষে (অষ্টাদশ অধ্যায়ে) অর্জ্জুনকে আবার গুহ্যতম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ সাধনের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে ইহা বর্ণন করিয়াছেন,

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥
পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষ আজ্ঞা বলবান॥

শ্রীভগবানের এই আজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস হইলে জীব সর্ব্বপ্রকার সাধন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তিযোগেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন,

"এই আজ্ঞা বলে যবে ভক্তের শ্রদ্ধা হয়।
সর্ব্বকার্য্য ত্যজি তবে কৃষ্ণকে সেবয়॥

যথার্থরূপে কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বতোভাবে এই ভক্তিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরম মঙ্গলের আলয় এই ভক্তি-যোগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভর চেষ্টিত, শাস্ত্র তাঁহাদিগকে "স্থূল-তুষাবঘাতা" বলিয়া বর্ণনা করেন। ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল "তুষকে" আঘাত করিলে যেমন কোনই ফল লাভ হয়না, তেমনই ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানাদি-সাধনে কোন ফলই পাওয়া যায়না।

অনেক যোগিপুরুষ যোগ-সাধনে বাঞ্ছিত ফল না পাইয়া লৌকিক চেষ্টাদি শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ ও গীতায় এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা করিয়া যদি কখনও কেহ ভক্তিযোগ হইতে ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলেও তাঁহার মহান্ অনর্থ সংঘটিত হয়না। এমন কি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার কোন প্রকারই অমঙ্গল ঘটেনা। ভগবৎ-ভক্তির অলৌকিক মাহাত্ম্যে ভরত মহাশয় মৃগ-দেহ ধারণ করিয়াও পরম কৃতার্থ হইয়াছিলেন। হাহা ও হুহু গন্ধর্ব্বদ্বয় গজ ও কুম্ভীর--দেহে ভগবান্ নারায়ণের কৃপা পাইয়াছিলেন।

একদা গন্ধর্ব্ব-রাজ-সভায় নৃত্যগীতাদি হইতেছিল। উর্ব্বশী ও মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্যবিদ্যায় আপনাদিগের পারদর্শিতার পরিচয় দিতেছিলেন, হাহা ও হুহু প্রভৃতি সঙ্গীতালাপ-পারদর্শী গন্ধর্ব্বগণও তথায় ছিলেন। তাঁহারাও নৃত্যে ব্রতী হন। গন্ধর্ব্বদ্বয় পরস্পরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—জানিবার নিমিত্ত দেবরাজের নিকট প্রার্থনা জানান। দেবরাজ বলেন, তোমাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা নির্ণয়ে আমি অসমর্থ। মহর্ষি দেবল সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমাদের উৎকর্ষ বিচার করিয়া একজনকে জয়ী করিবেন।

গন্ধর্ব্বদ্বয় দেবলের আশ্রমে উপনীত হইলেন। উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা-গ্রহণে নির্ণয় করিতে মহর্ষিকে অনুরোধ করিলেন। ঋষিবর তখন ধ্যান-মগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া অহঙ্কৃত গন্ধর্ব্বদ্বয় অবজ্ঞা-সূচক হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি নৃত্য বিদ্যার কিছুই অবগত নহে, আমরা অনর্থক ইহার নিকট আসিয়াছি।"

গন্ধর্ব্বদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি দেবল আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "রে গর্ব্বিত গন্ধর্ব্বদ্বয়! আমার অভিসম্পাতে এখনই ঘৃণিত যোনিতে তোদিগের জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। একজন মাতঙ্গরূপে গিরিগহ্বরে এবং অপরে কুম্ভীররূপে মেরুপৃষ্ঠে জন্মলাভ করিবে।" গন্ধর্ব্বগণের অভিসম্পাত শ্রবণে জ্ঞান হইল। কাতর প্রাণে ঋষিবরের শ্রীচরণে শাপ-বিমোচনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তাহাদিগের কাতরতায় মহর্ষির করুণা হইল। তিনি বলিলেন, "একদা তৃষ্ণাতুর হইয়া গজেন্দ্র সরোবরে জলপানের জন্য গমন করিলে, কুম্ভীর তাহাকে আক্রমণ করিবে। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইবে। আসন্ন মৃত্যুর হস্ত

হইতে উদ্ধার লাভের জন্য বিপন্ন গজ আর্ত্তস্বরে দীনবন্ধু শ্রীহরিকে স্তব করিবে। ভবভয়-হারী শ্রীহরি স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইবেন। গজেন্দ্র এবং কুম্ভীর উভয়েরই মোক্ষ বিধান করিবেন।"

গন্ধর্ব্বদ্বয় গজ ও কুম্ভীর-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পিপাসাতুর করিরাজ জলপানাশায়ে সরোবরে উপস্থিত হইলে কুম্ভীর তাহাকে গ্রাস করিলেন। গজেন্দ্র কাতরপ্রাণে শ্রীভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন; সম্মুখে একটী পদ্মপুষ্প অবলোকন করিয়া গজেন্দ্র শুঁড় দ্বারা ভগবৎ-চরণে অর্পণ করিলেন। তখন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ গরুড়ে আরূঢ় করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। গরুড়ের প্রযত্নে গজ কুম্ভীরের যুদ্ধ নিরস্ত হইল।

জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী প্রভৃতির অনুষ্ঠিত যোগের ফললাভে ভক্তির একান্ত অপেক্ষা দৃষ্ট হইয়া থাকে,

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।"

কর্ম্ম যোগাদির অনুষ্ঠিত কর্ম সমাপ্তির সময় ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সেই সমস্ত শাস্ত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিষ্ণু--স্মরণ ব্যতীত কর্ম্ম ফলের সিদ্ধি লাভ হয় না, তাই শাস্ত্র সর্ব্বশেষে বিষ্ণু-স্মরণের বিশেষ বিধান করিয়াছেন,

"অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥

ভক্তিযোগই যথার্থ পক্ষে ভবরোগের মহৌষধি। ইহা সুমিষ্ট। কুইনাইন জ্বরঘ্ন কিন্তু তিক্ত। খাইতে মুখ বিকৃত হয়। আবার সর্ব্বপ্রকার জ্বর কুইনাইনে আরোগ্যও হয় না। সর্ব্বক্ষেত্রে কোন রোগেরই সমান ফলপ্রদ অব্যর্থ ঔষধি দেখা যায় না। ভক্তি কিন্তু ভবরোগের অব্যর্থ মহৌষধি। ইহা পান করিতে মুখ তিক্ত হয় না, বরং অপূর্ব্ব সুমিষ্ট লাগে। "ভক্তি" রস-স্বরূপা বলিয়াই পান করিতে বলা হইয়াছে। ইহা আবার শ্রোত্র, মন ও রসনা প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা একই সময় পান করা যায়। এই ভক্তিরস আস্বাদন (হরিনাম কীর্ত্তন) করেন বলিয়া রসনা প্রকৃতপক্ষেই রসনা, নতুবা সে রসনা, রসনা নহে, ভেক জিহ্বা।

সুদুর্লভ মানব দেহলাভ করিয়াও এই ভক্তিযোগের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে নিতান্তই মন্দভাগ্য বলিতে হয়। নীরস প্রাণকে সরস করিতে, চির

ত্রিতাপ-তাপিত হৃদয়কে জুড়াইতে, জীবন-মরুভূমিতে শান্তির সুধা-নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিতে, ভক্তিই সর্ব্বোত্তম উপায়।

বন দাবানলে দগ্ধ হইয়া বন্য পশুকুল একান্ত আকুলপ্রাণে যখন সুরধুনীর সুশীতল সলিলে অবগাহন করে, তখন তাহাদের প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া থাকে। মানবও যদি ভব-দাবানলের নিদারুণ জ্বালার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আকাঙ্ক্ষায় ভক্তি-সুরধুনীতে অবগাহন করেন, তবেই প্রকৃতপক্ষে সুশীতল হইতে পারেন। অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকায়ই মায়ার হস্তে আমরা লাঞ্ছিত কলেবর হইতেছি, যদি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতাম, তবেই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম,

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
তাতে কৃষ্ণভক্তি করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

নিদাঘের দারুণ অরুণের প্রখর কিরণে চাতক যখন একান্ত তৃষিত হইয়া পিউ পিউ রবে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত করে, তখনই বারিদ তাহাকে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। বর্ষণোন্মুখ নবমেঘ সন্দর্শনে চাতকের আনন্দের সীমা থাকে না, সে এক দৃষ্টিতে সেই নবীন মেঘের পানে তৃষিত নয়নে শুধুই তাকাইয়া থাকে। তাহার প্রাণে কত আশা, নবমেঘ হইতে বৃষ্টি ঝরিবে, তাহার প্রাণের দারুণ পিপাসা দূরীভূত হইবে।

জীবেরও যখন তৃষিত চাতকের মতন এমনই অবস্থা হয়, প্রাণ কেবলই ছটফট করে, তখনই তাহার হৃদয়াকাশে অভিনব নবমেঘ উদিত হইয়া শান্তির সুধামধুর-ধারায় তাহাকে সুশীতল করেন। তাহার তাপিত প্রাণ চিরদিনের মত শীতল হইয়া থাকে। সে একদৃষ্টিতে কেবল সেই অভিনব রূপ নিরীক্ষণ করে। তাহার দেখার সাধ আর মিটেনা, বরং যতই দেখে ততই তাহার সেই মোহন-মধুর-মূর্ত্তি দেখার সাধ বৃদ্ধি হয়। সেই নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, সেই অপূর্ব্ব রূপ-দর্শনে একান্ত কৃতার্থ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে ভক্তির চতুঃষষ্টি (৬৪) অঙ্গের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার নিম্নোক্ত পাঁচটী অঙ্গ প্রধান। শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা, রসিক

ভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন; সজাতীয় মহত্তর স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বাস,

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন॥"

শাস্ত্র-বিধি-অনুসারেই ভগবদ্ভক্তি, যাজন করিতে হয়। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত-মতে ভজন করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। তাহাদের উত্তমা গতির পরিবর্ত্তে অধোগতিই হইয়া থাকে,

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য কুতার্কিকগণ অনুভব করিতে পারেন না। ষড়-দর্শনাচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,

"তার্কিক শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥

দুর্ভাগা জ্ঞানিগণ জ্ঞানরূপ নিম্বফল ভক্ষণ করেন, কিন্তু ভাগ্যবান্ ভক্তগণ প্রেমরূপ আম্র-মুকুল আস্বাদন করিয়া থাকেন,

"অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্।

অভক্তগণ এই ভক্তিরস আস্বাদন করিতে অসমর্থ। ভাগ্যবান্ কৃষ্ণভক্ত-গণই একমাত্র এই রস আস্বাদনে পূর্ণ অধিকারী,

"এই রসাস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণ-ভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥

ভক্তির অলৌকিক মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভুক্তি সিদ্ধি, মুক্তি-প্রভৃতির সুখ, ভক্তি-সুখের নিকট একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভক্তির মত এম সর্ব্বাকর্ষক এবং সর্ব্বাহ্লাদক আর দ্বিতীয় নাই,

"সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব-বিস্মরণ॥

ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়য়ে যার গন্ধে।

অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণ-কৃপায় বাঁন্ধে"

একমাত্র ভক্তিই সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারেন, ভক্তি অলৌকিক শক্তিতে চণ্ডালকেও জাতি-দোষ হইতে পবিত্র করেন। শ্রীভগবান্ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই লভ্য,

"ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।

ভক্তিঃ পুনাতিমন্নিষ্ঠ-শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

শ্রীভগবান্ একমাত্র ঐকান্তিকী ভক্তি-দ্বারাই লভ্য, গীতা বলিতেছেন,

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥

হে অর্জ্জুন! পরিদৃশ্যমান পদার্থ-নিচয় যাঁহার অন্তর্নিহিত, যিনি কারণরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত, সেই শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে নিশ্চিতই ভক্তি-দ্বারা পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ গীতার ১৮শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

একমাত্র ভক্তি দ্বারা আমার ভাব, স্বরূপ ও আমাকে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। আমার তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ভক্ত আমাতেই প্রবিষ্ট হন। কর্ম্ম ও যোগাদি-সাধনে কখনই এইরূপ ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভক্তি জিনিষটীর মধুরতা বর্ণনার ভাষা নাই। "ভক্তি" প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করা যায়, যেমন ভোজন-নিরত ব্যক্তির প্রতি-গ্রাসে ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে ভোজন-জনিত সুখ, উদরপূর্ত্তি-জনিত তৃপ্তি এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি-জনিত প্রসন্নতা, এই তিনটীই একসঙ্গে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ ভজন-পরায়ণ ভক্তের ও ভজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমলক্ষণা-ভক্তি, পরমেশানুভব, এবং বিরক্তি (বৈরাগ্য) এককালেই দেখা যায়,

"ভক্তি পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

এই ভক্তি-প্রভাবেই শ্রীভগবল্লাভ সহজসাধ্য।

সামান্য মাত্র অগ্নি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া যেমন কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ ভগবদ্বিষয়িনী কথঞ্চিৎ ভক্তির উদয় হইলে, যাবতীয় পাপরাশি বিনষ্ট

হইয়া থাকে। সৎ-ব্যক্তিগণ একমাত্র শ্রদ্ধা-সংবলিত ভক্তি-দ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করেন।

সত্য ও দয়া-সংযুক্ত ধর্ম্ম, তপস্যা-যুক্ত বিদ্যা এই সকল শ্রেষ্ঠ গুণ-সমূহ ভক্তি-বিহীন হইলে আমাকে সম্যকরূপে পবিত্র করিতে পারেনা।

"ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতিহি।

যেমন তরুর মূলে বারি সেচন করিলে, তাহার স্কন্ধ, শাখা ও প্রশাখা প্রভৃতির পুষ্টি হইয়া থাকে, প্রাণের তৃপ্তি সাধনে যেমন ইন্দ্রিয়গণের পরিপোষণ হয়, সেইরূপ একমাত্র ভক্তির ফলে অন্যান্য (কর্ম্ম, জ্ঞানাদি) সাধনা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কর্ম্মজ্ঞানাদি নিরতিশয় ক্লেশ-সাধ্য, কিন্তু এই ভক্তি-যাজন একান্ত সুখময় ব্যাপার।

ভক্তি-অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়গণের ক্লেশভোগের কোনই সম্ভাবনা নাই। ইহাতে কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই অবলম্বনীয়। ভগবৎ-কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি বড়ই আনন্দময়, বড়ই মধুর। ত্রিতাপ-বিধুর জীবন ইহার ফলে চির সুশীতল হইয়া থাকে। কবি গাহিয়াছেন, ত্রিতাপ-বিধুর প্রাণ মধুর হরিনামে জুড়াইবে। "স্বভক্তহিতকারিণাতদীয়দেহোৎকণ্ঠাদিবর্দ্ধনচতুরেণ ভগবতৈব দুঃখস্য দীয়মানত্বাৎ কর্ম্মফলত্বাভাবেন ন প্রারব্ধত্বমিত্যাহুঃ।"

ভক্তির ফলে তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-কৃপা লাভের এবং শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের শত শত মধুর ইতিহাস শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শকুনির কপট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দুঃশাসন একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভায় আনয়ন করেন। মহাবল বৃকোদর গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন প্রভৃতি রোষে একান্ত অধীর হন। ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করেন। অসহায়া দ্রৌপদী স্বামিগণের চরণে লজ্জা রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। স্বামিগণকে নিরুত্তর দর্শন করিয়া সভাস্থ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক লজ্জা নিবারণের জন্য করুণ বাক্যে প্রার্থনা কালীন সভ্যগণ অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ না করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। সময় পাইয়া কর্ণ প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তগণ নানাবিধ পরিহাস বাক্যে বিপন্না দ্রৌপদীকে

মর্ম্মাহত করিতে লাগিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন উরুর বস্ত্র উত্তোলন করিয়া নীচতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও কটূক্তি প্রয়োগে দশানন হইলেন। দ্রৌপদী আবার কাতর বিলাপে সভাসদ্‌গণের হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন। সহৃদয় কিন্তু শক্তিহীন সভ্যগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। রাজাশ্রয়ে প্রতিপালিত আর্ত্তিগণ ভয়ে কিছুই বলিলেন না। চতুর্দ্দিকে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। পাপিষ্ঠ দুঃশাসন একান্ত অসহায়া দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাহার সহায়তা করিল। তখন বিপন্না দ্রৌপদী আপনাকে একান্ত সহায়হীনা মনে করিয়া অনাথ-বন্ধু ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণকে আর্ত্তস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নয়ন-জলে তাঁহার বদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দুঃখের-সাগরে বেদনার শত শত লহরী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। হৃদয়ের বেদনায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। রমণীর লজ্জা প্রাণ হইতেও অধিক। তিনি সখা কৃষ্ণকে উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ হে, আগে আমার মস্তকে বজ্রপাত হউক, দয়াময় তুমি অভাগিনীকে এই বর প্রদান কর। লজ্জায় ম্রিয়মাণা দ্রৌপদী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আকুল প্রাণে বারংবার শ্রীকৃষ্ণকে কেবলই উচ্চৈঃস্বরে প্রাণের বেদনা জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন। রুক্মিণী প্রাণনাথের পাদ-সম্বাহন করিতেছিলেন। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিয়া উঠিলেন। নীলকান্তমণি যেন গলিয়া যাইতে লাগিলেন। কান্তা শ্রীকৃষ্ণের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ভাবিনী-শিরোমণি সাধ্বী রুক্মিণী অস্থিরা হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া প্রিয়তমা রুক্মিণীকে প্রবোধ দান করিলেন। দ্রুতগতিতে হস্তি-নায় উপনীত হইলেন। সকলের অলক্ষ্যে আকাশ-মার্গে রহিলেন। কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। প্রাণসখী দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ এবং তাঁহার ভক্তির মাধুরী প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আজ "বসন"-রূপ ধারণ করিলেন। বসনের ছলে দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

দুষ্টমতি দুঃশাসন যতই দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, দ্রৌপদীর অঙ্গে ততই নানাবিধ মনোহর বস্ত্র দেখা যাইতে লাগিল। নানাবিধ বহুমূল্য-বস্ত্রে রাজসভা পূর্ণ হইল। সভ্যগণ এই রহস্যের মর্ম্ম ভেদ করিতে পারিলেন না। কেবল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বস্ত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিপদ-

তখন ভক্তবৎসল শ্রীভগবান এইরূপে সতী দ্রৌপদীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম-সখা অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বেই (দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণকালেই) ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মৃত্যু বিধান করিয়া রাখিয়াছি। বস্তুতঃই পতিপ্রাণা সতীর অবমাননার ফলে সবংশে মরিতে হয়।

এই আখ্যানে ইহাও ধ্বনিত হইল, শ্রীকৃষ্ণই সকলের লজ্জ-নিবারণের কারণ। তিনি বিপদ-ভঞ্জন, মধুসূদন। তিনি অসাধুরূপ অসুরগণের হস্ত হইতে ভক্তগণকে রক্ষা করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম মুরারি।

মুর-নামক অসুর শিব-বরে ত্রিভুবনে অজেয় হইয়াছিলেন। মহাদেব বর প্রদান করিয়াছিলেন, যে তাহার বক্ষ স্পর্শ করিবে, সে-ই বিনষ্ট হইবে। মুরাসুর দেবতা ও দ্বিজগণের হিংসা করিতে লাগিল। ভগবান্ নারায়ণ আপন ভক্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। যুদ্ধার্থ মুরাসুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আপন বক্ষে বারম্বার করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, যদি কেহ সমযোদ্ধা থাক, অগ্রসর হও। আমি এখনই তাহাকে নিধন করিব। আমার সমান বীর জগতে আর কে আছে ?

অভিমানী মুরাসুর নারায়ণের বাক্যে ধৈর্য্যহীন হইলেন। তাহার জ্ঞান লোপ হইল। একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নারায়ণের মত আপন বক্ষে করাঘাত করিয়া আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্য ও বীর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বক্ষে করাঘাত করিয়া বিপক্ষকে অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করিলেন। দুর্বৃত্ত অসুরের আর সহ্য হইল না। ক্রোধে অধীর হইয়া আপন বক্ষে করাঘাত করিল। বক্ষে হস্তস্পর্শ মাত্রই মুরাসুরের মৃত্যু হইল। তখন দেবগণ নারায়ণকে মুরারি বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ধন প্রাপ্ত হইলে যে প্রকার সুখ-ভোগ ঘটে, সেই প্রকার ভক্তির ফলে শ্রীভগবানে প্রেম লাভ হইয়া থাকে। জীব যখন প্রেমের সহিত শ্রীভগবানকে আস্বাদন করেন, তখনই তাঁহার আসা যাওয়ার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অনন্ত-

ফল, ভক্তির মুখ্য ফল নহে। শ্রীভগবৎ-সেবারূপ অনন্ত লাভই ভক্তির মুখ্য ফল।

এই জন্যই শাস্ত্র কর্ম ও জ্ঞানাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ করেন।

"ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান-যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

নান যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান জীব এই ভক্তি-লতার বীজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন যদি সাধক হৃদয়-ক্ষেত্রে এই বীজ বপন করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচন করেন, তবেই তিনি কৃতার্থ হইয়া থাকেন। সেই ভক্তিলতার বীজ ব্রহ্মাণ্ডে, এমন কি ব্রহ্মালোক ভেদ করিয়া পর ব্যোমে, তৎপর তদুপরিস্থ গোলোকধামে গমন করেন। গোলোক হইতে আবার শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইয়া ভক্তি-লতিকা শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকেন। সেখানে বিস্তারিত হইয়া প্রেম-ফল প্রসব করেন। মালী (সাধক এই ভূলোক হইতে সর্ব্বদাই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল-সিঞ্চন করিয়া থাকেন। তখন এই ভক্তিলতা হইতে সুপক্ব প্রেম-ফল পতিত হয়। মালী (সাধক) এই ভক্তি-লতাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ রূপ কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। মালীর আনন্দের সীমা থাকেনা, প্রেম-ফলের রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হন। এই ভক্তি ফলই পরম ফল, পরম পুরুষার্থ ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ইহার নিকট অতি তুচ্ছ।

"এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥

ভক্তি, জ্ঞান দ্বারাই লাভ করা যায়, ইহা একান্ত অজ্ঞেরাই বলিয়া থাকেন। জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, তাহা হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান মুক্তি দান করিতে কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু ভক্তি সহজে দান করেন না,

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।"

ভক্তির স্বভাব-কল্পলতা-সদৃশ। লতা যেমন অঙ্কুরিতা হইলে প্রথমে দুইটী পত্র দেখা যায়, ভক্তিও হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিতা হইলে প্রথমে দুইটী পত্রে বিভূষিতা হন, একটীর নাম ক্লেশঘ্নী, অপরটীর নাম শুভদা।

ক্লেশ বলিতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি। প্রারব্ধ, রূঢ় ও বীজ নামক যে পাপাদি-তাহারা এই ক্লেশেরই অন্তর্গত। আর বিষয়-বৈতৃষ্ণ্য, ভগবদ্বিষয়ক সতৃষ্ণত্ব, আনুকূল্য, কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সারল্য, সাম্য, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মানদত্ব, অমানিত্ব ও সর্ব্বসুভগত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণকেই শুভ বলা যায়। ভক্ত এই সমস্ত সদ্‌গুণে মণ্ডিত হইয়া থাকেন।

তবে ভক্তের কখনও যে ক্লেশাদি দেখা যায়, তাহা শ্রীভগবৎ-ইচ্ছায়ই হইয়া থাকে। রোগ-শোকাদি দুঃখ ভক্তের প্রারব্ধের ফল নহে। যুধিষ্ঠির ও বিদুর, ধ্রুব ও প্রহ্লাদাদিরও সাংসারিক দুঃখ দৃষ্ট হয়,

"রোগ-শোকাদি দুঃখ প্রারব্ধহেতু নয়।
কোন জন্মে হয় তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণ ক'ন যারে আমি অনুগ্রহ করি।
তার ধন-আদি সব ক্রমে ক্রমে হরি॥
নির্ধন দেখিয়া তারে ত্যাগ করে জন।
নির্ধনতা হয় মদনুগ্রহের কারণ॥
ভক্ত-হিতকারী কৃষ্ণ দৈন্য বাড়াইতে।
ভক্তে দুঃখ দেন নাহি কর্ম্মফল তাতে॥
প্রারব্ধ অভাব হন যুধিষ্ঠিরাদিতে।
প্রেম-বৃদ্ধিহেতু ক্লেশ কৃষ্ণের ইচ্ছাতে॥"

ভক্ত সাধারণ দৃষ্টিতে দুঃখী বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি দুঃখহীন। সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান যাঁহার অন্তরে বিরাজিত, তাঁহার হৃদয়ে দুঃখ আসিতে পারে না,

"কৃষ্ণ-ভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ প্রবীণ॥

ভক্তের দৈন্য ও উৎকণ্ঠাদি বৃদ্ধির জন্যই লীলা-শক্তির ইচ্ছায় ভক্তেরা দুঃখাদি দেখা যায়। উহা কর্ম্মফল-জনিত দুঃখ নহে। [illegible] তদীয়দৈন্যোৎকণ্ঠাদিবর্দ্ধনচতুরেণ ভগবতৈব দুঃখস্য দীয়মানত্বাৎ, কর্ম্মফল[illegible] ভাবেন ন প্রারব্ধং [illegible]। ভক্তি-অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়গণের ভোগ-যোগের কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহাতে কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদিই অবলম্বনীয়। ভগবৎকথা-

শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি বড়ই আনন্দময়, বড়ই মধুর। ত্রিতাপবিধুর জীবন ইহার ফলে চির সুশীতল হইয়া থাকে। কবি গাহিয়াছে—ত্রিতাপ বিধুর প্রাণ মধুর হরিনামে জুড়াইবে। ভক্ত কর্ম্মাধীন নহে। ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবৎ-কৃপার অধীন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ আবার নিত্যই ভক্তের অধীন। প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ যখন ভক্তের একান্ত অধীন, তখন ভক্ত কিছুতেই কর্ম্মাধীন হইতে পারে না।

ভক্তের রোগ-শোকাদি কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর প্রেম-বর্দ্ধন করিয়া থাকে। উৎকণ্ঠা-বিবর্দ্ধনই ইহার মুখ্য ফল। সেবানুরাগী ভক্তগণ এই প্রকারে ভক্ত-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন, ইহাও একতম কারণ বটে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীর শুশ্রূষা করিয়া শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী কৃষ্ণ-প্রেমপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শোক, দুঃখাদি, মায়ার ফল। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে মায়া ভক্তের হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন না। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন অন্ধকার থাকে না, হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেও তেমনই মায়া সেখানে অবস্থান করিতে পারে না—লজ্জিতা হইয়া দূরে পলায়ন করেন। ভক্তির প্রভাবে ভক্ত মায়া-রাজ্যের পর পারে গমন করিয়া থাকেন,

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥

জ্ঞানিগণ জীবন্মুক্ত বলিয়া মাত্র অভিমান করেন, প্রকৃত পক্ষে ভক্তই জীবন্মুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতীত কিছুতেই চিত্ত-শুদ্ধি হয় না,

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি-শুদ্ধি নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে"॥

কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি ভক্তির মত শ্রীভগবানকে কিছুতেই বশীভূত করিতে পারে না। শাস্ত্র, শ্রীভগবান জ্ঞানাতীত—এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। শ্রীভগবান ভক্তির অতীত এইরূপ কখনই বলেন নাই, বরং ভক্তির একান্ত অধীন ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীভগবান কর্ম্ম-জ্ঞানাদির বশীভূত হন না, কিন্তু ভক্তিযোগে অবশ্যই বশীভূত হইয়া থাকেন,

"জ্ঞান কর্ম্মে যোগে কভু নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক নাম প্রেম রস"॥

শ্যাম, রামকে বড়ই ভাল বাসিতেন। রামও শ্যামকে একান্ত ভাবে সেবা করিতেন। না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। কোন কারণে শ্যাম রামের প্রতি অপ্রসন্ন হন। রাম নানা প্রকারে তাঁহাকে মিনতি করিলেন, কিন্তু শ্যাম কিছুতেই তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। রাম নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শ্যামের একতম প্রিয় বন্ধুর চরণে শরণাগত হইলেন। তিনি শ্যামকে বিশেষরূপে অনুনয় করিলেন, কিন্তু শ্যাম তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এমন কি তাঁহাকে দ্বারের নিকটেই আসিতে দিলেন না।

রাম তখন শ্যামের একতম প্রিয়তর বন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই বন্ধুও শ্যামকে কত প্রকারেই সাধিলেন, কিন্তু শ্যাম সেই প্রিয়তর বন্ধুর অনুরোধও রক্ষা করিলেন না। বন্ধু শ্যামকে সাধিতে সাধিতে দ্বারের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিলেন, কিন্তু শ্যাম তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

রাম একান্ত বিপন্ন হইয়া শ্যামের প্রিয়তম বন্ধুর শরণাপন্ন হইলেন। সেই প্রিয়তম বন্ধু ও শ্যামকে বিস্তর অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি গৃহের ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেন, শ্যাম দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন।

রাম, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অবশেষে কাতর প্রাণে শ্যামের পতিব্রতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্যামের পত্নী রামকে আশ্বস্ত করিলেন, বলিলেন, তিনি অবশ্যই পতির মন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন করিয়া দিবেন। শ্যামের পত্নী একদিন সুযোগ বুঝিয়া অভিমান করিয়া বসিলেন। শ্যাম পত্নীকে কত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু পত্নী কেবলই বদন অবনত করিয়া রহিলেন। শ্যামের সঙ্গে কিছুতেই কথা বলিলেন না।

শ্যাম পত্নীর মনের ভাব বুঝিতে না পরিয়া একান্ত কাতর প্রাণে পত্নীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক সাধ্য সাধনার পর পত্নী পতির প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ভরসা পাইয়া শ্যাম পত্নীর নিকট কথা বলিবার জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা জানাইলেন।

পতির কাতরতা দেখিয়া পত্নী প্রসন্না হইলেন। আদরের স্বরে বলিলেন,

"তুমি যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর, তবেই তোমার সঙ্গে কথা বলিব, নতু এই শেষ কথা।"

শ্যাম অবাক্ হইয়া পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কাতর প্রাণে বলিলেন, দেবি! আজ কোন্ প্রাণে এমন অকরুণ ব্যবহার করিতেছ? আমি কখনও কি তোমার কোন কথা লঙ্ঘন করিয়াছি? তোমার আদেশ ত আমি সর্ব্বদাই অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিয়া থাকি।

সহাস্য বদনে শ্যামের পত্নী পতিকে নিবেদন করিলেন, তুমি রামের প্রতি যে কঠোর ব্যবহার করিতেছ, তজ্জন্য আমি বড়ই দুঃখিত। শত দোষে দোষী হইলেও তাহাকে তোমার ক্ষমা করিতেই হইবে। তুমি তাহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ কর। আমার শপথ, এ বিষয় আর তুমি কোনই প্রতিবাদ করিতে পারিবে না।

পত্নীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শ্যাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দেবি! এই জন্য এত শপথ? বল ত, আমি কোন্ দিন তোমার কোন্ কথা শুনি নাই? দেবি! তুমি যাঁহার প্রতি প্রসন্না, আমি কি তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারি? তোমার কৃপা যদি কেহ পায়, তবে আর তাহার আমাকে না পাইবার কারণ নাই। আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। তোমার আশ্রিতকে হৃদয়ে ধরিয়া প্রাণ জুড়াইয়া থাকি। আমি আমা অপেক্ষাও তাঁহাকে অধিকতর ভালবাসি। তাঁহাকে আত্মা পর্য্যন্ত দান করিয়াও কৃতার্থ বোধ করি না। আপনাকে তাঁহার নিকট চিরঋণী বলিয়া মানিয়া থাকি। রাম নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিলেন, তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। শ্যাম দৌড়িয়া গিয়া রামকে গভীর প্রেমালিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, রাম! আজ হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার হইলাম। রাম, শ্যামের শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্যামের মধুর কৃপা দর্শন করিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

উপাখ্যানটীর প্রকৃত তত্ত্ব এই—প্রথম যিনি শ্যামের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগ দ্বারের পার্শ্বে পর্য্যন্তও যাইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় বার যিনি প্রার্থনা জানাইলেন, তিনি জ্ঞান। জ্ঞানযোগ দ্বারের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

তৃতীয়বার যে প্রিয়তম বন্ধু প্রার্থনা জানাইলেন, তিনি যোগ। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে পারিলেন না।

চতুর্থবার যিনি প্রার্থনা জানাইলেন, তিনি অন্য কেহ নহেন, ভক্তি-যোগ। ভক্তির কৃপায় বাম কৃতার্থ হইলেন। ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোন ভাবনা থাকে না। শ্রীভগবৎ-কৃপা লাভে চির কৃতার্থ হওয়া যায়। শ্রীভগবান ভক্তির একান্ত বশীভূত, এই ঘটনায় সুন্দররূপে প্রমাণিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা দুষ্প্রাপ্য। একমাত্র ভক্তির দ্বারা পরিপূর্ণরূপে তিনি লভ্য হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

'নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥

ভগবান গোপিকানন্দন, ভক্তিমান জনগণের যেমন সুখলভ্য, দেহাভিমানী তাপসগণের এবং নিবৃত্তাভিমানী জ্ঞানিগণের তেমন সুলভ্য নহেন।

ভক্তিতে ভগবৎ-অনুভব ও বৈরাগ্য যুগপৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃত্যু, তৃণাবৃত কূপের ন্যায় অলক্ষ্য। কখন মৃত্যু ঘটে, স্থিরতা নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবন নাশের সম্ভাবনা। কাহারও মৃত্যু-সংবাদ হঠাৎ প্রাপ্ত হইলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই, কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা যে বাঁচিয়া আছি, প্রকৃত পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা। এই মর-জগতে কেহই মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পান নাই। বুদ্ধিমান্ জনগণের সময় থাকিতে সর্ব্বসাধন-শ্রেষ্ঠ এই ভক্তি-যোগের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যই কর্ত্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সাধকের নিকট ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে।"

একমাত্র ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব পরিপূর্ণতমরূপে উপলব্ধি করা যায়। ভক্তির বলে শ্রীভগবানের ভক্তবৎসলতের কথা শাস্ত্রে বহুরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ভিক্ষোপজীবি শ্রীদামা বিপ্র বড়ই দরিদ্র। উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্রের অভাব। নিতান্ত দুঃখে তাঁহার দিন কোন প্রকারে যাইতেছে। এই দুঃখের মধ্যেও প্রকৃত পক্ষে তিনি সুখী। শাস্ত্র বলেন, ভক্তের ব্যবহার-দুঃখও তাঁহার প্রাণে আনন্দের সুধা-মধুর ধারা বর্ষণ করিয়া থাকে,

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
সেও এক জেন তুমি পরমানন্দ সুখ॥"

সাংসারিক দুঃখে নিরতিশয় প্রপীড়িত হইয়া শ্রীদামার পত্নী একদিন শ্রীদামাকে বলিলেন, দেখ, এত কষ্ট আর সহ্য হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ত তোমার বাল্য-সখা। তিনি এখন দ্বারকার রাজা। একবার প্রাণ সখার নিকট আপন দুঃখ জানাইলে হয় না?

শ্রীদামা কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বক্ষ বহিয়া দরদর ধারে চোখের জল ঝরিতে লাগিল। সুদামা বলিলেন পত্নী, আমি বিষয়-সুখের প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট করিতে পারিব না। অনন্তকাল দুঃখ-সাগরেই ডুবিয়া রহিব, তথাপিও আত্মসুখের কামনা যেন আমার হৃদয়ে জাগরিত না হয়।

পত্নী পতির উন্নত হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া কৃতার্থা হইলেন। কৌশলে পতিকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন। পত্নী বলিলেন, আচ্ছা বিষয়-সুখ শ্রীকৃষ্ণের নিকট তুমি প্রার্থনা করিও না। প্রিয় সখাকে একবার দেখিয়া আস। বহুদিন যাবত যে দুইবন্ধুর পরস্পর সাক্ষাৎ নাই।

প্রিয়-সখার কথা আলোচনায় শ্রীদামা প্রেমবিহ্বল হইলেন। পত্নীকে বলিলেন, সখাকে দেখিতে যাইব, কিন্তু সঙ্গে লইব কি? সখাকে দিবার মত যে অভাগার কিছুই নাই। সখা আমার রাজরাজেশ্বর, আমি যে পথের ভিখারী।

পত্নী সামান্য তুষ-মিশ্রিত তণ্ডুল পতির মলিন ও শতধা ছিন্ন জীর্ণ বস্ত্রের অঞ্চলে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন। শ্রীদামা প্রিয়-সখাকে দিবার মত অন্য কোন বস্তু না পাইয়া অগত্যা সেই তুষ মিশ্রিত তণ্ডুল লইয়াই শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যাত্রা করিলেন।

শ্রীদামা দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। রাজতোরণ অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; শ্রীদামাকে দর্শন করা মাত্রই সম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন। হায়

বদনে বলিলেন, প্রাণ-সখে, ভাল আছ ত ? এত সুদীর্ঘকালের পর কি আমাকে মনে পড়িয়াছে ? শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-সখা শ্রীদামাকে প্রেমভরে সুগভীর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

শ্রীদামা বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর ভালবাসা দর্শন করিয়া একান্ত বিমোহিত হইলেন। কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইল। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের চাঁদবদনের পানে অনিমিষে তাকাইয়া রহিলেন। নয়ন-জলে তাঁহার পরিধেয় বসন ভিজিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও বন্ধুর প্রেম-জলে স্নাত হইলেন।

বহুদিন পর বাল্য-সখাকে গৃহে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানন্দে অধীর হইলেন। সখাকে কি প্রকারে সুখী করিবেন, শুধু তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বন্ধুর সঙ্গে শৈশবের কত কথারই আলোচনা হইল। দুইজনে পরস্পর গ্রীবা জড়াইয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। কিছুক্ষণ পর উভয়ের মনের আবেগ মন্দীভূত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ একটু সুস্থ হইয়া শ্রীদামাকে বলিলেন, সখে ! এতদিন পর আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, অবশ্যই আমার জন্য কিছু না কিছু প্রীতি-উপহার আনিয়াছ, দাও, ভোজন করি।

বন্ধুর কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীদামা লজ্জায় বদন অবনত করিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আমি কোন্ প্রাণে তুষ মিশ্রিত তণ্ডুল-কণা প্রিয়-সখাকে খাইতে দিব। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। শ্রীদামার আজ দুঃখের সীমা নাই। তাঁহার হৃদয়-সরোবরে দুঃখের লহরী কেবলই উথলিয়া উঠিল। মত্ত গজ সদৃশ নানাভাবের প্রহারে যেন তাঁহার দেহরূপ ইক্ষুবন দলিত হইতে লাগিল।

অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-বন্ধু শ্রীদামার অবস্থা অনুভব করিলেন। বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ও ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর আপন অন্তরের ভাব গোপন করিয়া পরিহাসের সহিত প্রিয়-সখার বসন গ্রহণে চেষ্টিত হইলেন। শ্রীদামা পাশ কাটিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। একান্ত যত্নের সহিত অঞ্চলের তণ্ডুল-কণা-সমূহ গোপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যিনি সর্বভূতের হৃদয় পর্য্যন্ত দর্শন করেন, শ্রীদামা বহু চেষ্টায়ও তাঁহার নিকট তণ্ডুল-কণা

লুকায়িত রাখিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক প্রাণ সখার অঞ্চল হইতে তণ্ডুলগুলি গ্রহণ করিয়া একান্ত আনন্দিত মনে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীদামা কর কি, বন্ধু! কর কি বলিয়া বারম্বার শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষভাবে নিবারণ করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। শ্রীদামা সখার ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রিয়তম সখাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া মস্তকের উষ্ণীষ দ্বারা বন্ধুর গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন। রুক্মিণীদেবী শ্রীদামাকে সুশীতল তালবৃন্ত দ্বারা বীজন আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য মহিষীগণও নানাপ্রকারেই শ্রীদামাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পর শ্রীদামার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। শ্রীদামা কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবলই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। বেদবাদী ঋষিগণ যজ্ঞাদি-কর্ম্মে শ্রীভগবানকে এই জন্য কতই সাধ্য সাধনা করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান অনেক চেষ্টার পর আবির্ভূত হন। অনেক স্থলেই হয়তঃ ঋষিগণ কেবল মাত্র উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু ভক্তি-যোগে শ্রীকৃষ্ণকে আর তেমন সাধিতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক ভক্তের প্রীতি-উপহার ভোজন করিয়া থাকেন।

ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের দয়ার সীমা নাই। ভক্তিসহকারে যিনি যাহাই তাঁহাকে প্রদান করেন, তিনি তাহাই পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়াছেন,

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

ভক্তির সহিত পত্র (তুলস্যাদি) পুষ্প (কৈরব্যাদি) ফল (কদল্যাদি) প্রদান করিলে, ভক্তি-প্রদত্ত সেই সমস্ত দ্রব্য পরম সমাদরের সহিত আমি গ্রহণ করি।

ভক্তির ফল যেমন অক্ষয় ও অনন্ত, ভক্তি-সাধনও তেমনই সুখসাধ্য। পত্র, পুষ্প বা যে কোন সুলভ বস্তু সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতির সহিত প্রদান করিলে, প্রীত্যর্পিত সেই বস্তু শ্রীভগবান্ যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করেন

শ্রীভগবান্ অনন্ত-বিভূতি-পরিপূর্ণ ও পূর্ণকাম হইলেও ভক্তের দ্রব্যকে কখনই উপেক্ষা করেন না। ভক্তের প্রীতির ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-যুক্ত হইয়া ভক্তের ভক্তির আবেগে সেই সমস্তই গ্রহণ ও ভোজন করেন। বিশুদ্ধ মনে অর্পণ করিলেই তিনি গ্রহণ করেন, তাহা না হইলে গ্রহণ করেন না। "ভক্ত্যা"-শব্দের পর আবার "ভক্ত্যুপহৃত"-শব্দের তাৎপর্য্য ভক্তিই তাঁহার তোষিকা। দ্বিজত্ব ও তপস্বিত্ব প্রভৃতি তাঁহার তেমন প্রীতি-সম্পাদন করিতে পারে না, ঐ দুইটী শব্দে ইহা স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ ক্ষুদ্র দেবতাগণের মত বহু ব্যয়সাধ্য যজ্ঞাদি দ্বারা পরিতুষ্ট নহেন। তাঁহার পূর্ণ পরিতুষ্টি মাত্র ভক্তিতে। এই শ্লোকটীতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত হইলে পত্র, পুষ্প ও জলাদি সর্ব্বসুলভ বস্তুতেই শ্রীভগবান্ প্রীত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ (কৃষ্ণ)-ভক্তি অতিশয় সহজ, দেবতান্তর-ভক্তি বহুতর অর্থব্যয় ও পরম আয়াসসাধ্য—এই শ্লোকে ইহাও ধ্বনিত হইতেছে। ভগবৎ (নিজ)-ভক্ত ব্যতীত অন্য-দেব-ভক্ত যাহা প্রদান করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করেন না, এখানে ইহাও দ্যোতিত হইয়াছে। "প্রযতাত্মনঃ"-শব্দে রজস্বলাদি অপবিত্র দেহে দ্রব্যাদি অর্পণ করিলে শ্রীভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন না, ইহাই বুঝা যায়। শ্রীভগবান্ মনটী বিশুদ্ধ কিনা যেমন দেখেন, শরীরটীও শুদ্ধ কিনা তাহাও তেমনই দেখিয়া থাকেন। ধর্ম্ম সদাচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

"আচার এব ধর্ম্মস্য মূল, রাজন্"॥

এই শব্দের আরও একটী ধ্বনি আছে—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমার ভক্ত ভিন্ন অন্য দেবতার ভক্ত শুদ্ধান্তঃকরণ নহে। আজকাল অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন, শ্রীভগবানের মাত্র নাম-ভেদ, বস্তুতঃ গণেশ, কৃষ্ণ, কালী, ব্রহ্ম ও রুদ্রাদি এমন কি মহম্মদ ও যীশু পর্য্যন্ত একই বস্তু। এই কথাটী বড়ই অপরাধজনক। গীতায়ই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

হে অর্জ্জুন, শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহারা অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদের পূজাও আমারই পূজা বটে, কিন্তু তাহা বিধি-বিগর্হিত। ভগবান্ দেবকী-

নন্দন, ব্রহ্ম ও রুদ্রাদি দেবতার মূল। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অপরের ভগবত্তা। শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি-জ্ঞানে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনায়ও শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব মনে করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিলে কেবল অপরাধই সঞ্চিত হয়। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিতেছেন, আমি "সর্ব্বাত্মা," ইহা না বুঝিয়া, পৃথক ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা নিরতিশয় অজ্ঞতার পরিচায়ক,

> "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
> ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

আমি শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং ফল-প্রদাতা। অন্য দেবযাজীগণ এই তত্ত্ব না জানায় পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

অন্য-দেবোপাসকগণ তত্ত্বতঃ আমাকে জানেন না। যাঁহারা সূর্য্যের উপাসক, "সূর্য্যই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, সূর্য্যই আমার অভীষ্ট ফল-প্রদাতা, সূর্য্যই পরমেশ্বর," এই প্রকার ভাব পোষণ করেন।

পরমেশ্বর নারায়ণই সূর্য্য। সূর্য্য শ্রীভগবান্ নারায়ণে আমার শ্রদ্ধা বিধান করিবেন। পরমেশ্বর নারায়ণই সূর্য্যোপাসনার ফল-প্রদাতা, এইরূপ মদভিজ্ঞানরূপ তত্ত্বের অভাবে তাঁহারা মোহপ্রাপ্ত হন। যাঁহারা শ্রীভগবান্ নারায়ণকেই সূর্য্যাদিরূপে আরাধনা করি বোধে বিশ্বতোমুখ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। "সূর্য্যাদির" পূজা আমার বিভূতি-জ্ঞানেই করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যাদি দেবতাগণে পরমেশ্বর-বোধে পূজা করিতে নাই, এখানে ইহাই দ্যোতিত হইল।

ভক্তিভরে দ্রব্যাদি অর্পণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন, ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রজধামে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আরও অধিক কৃপা দেখিতে পাওয়া যায়। কিশোরী ব্রজগোপিকাগণ নবনীত উত্তোলন করিতে করিতে ভাবিতেন, এই নবনীর কিয়দংশও যদি শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারিতাম, তবে কৃতার্থ হইতাম। প্রাণের একান্ত সাধ থাকিলেও লজ্জায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নবনীত দিতে পারিতেন না। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনের ভাব অনুভবে চুরি করিয়া তাঁহাদের নবনীত ভক্ষণ করিতেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতেন না, যদি শ্রীকৃষ্ণকে নবনীত দিতে পারিতাম, ইহাই ভাবি-

তেন। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমমাখা নবনীত হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্পলতা কিশোরী-গোপীগণের চক্ষে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-কিশোররূপে প্রতিভাত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের একটী অপূর্ব্ব স্বভাব—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমক্ষে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। কংসের রঙ্গমঞ্চে যখন শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজগৃহে সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিভিন্নরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন,

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

অগ্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলে, মল্লগণের নিকট অশনি সদৃশ, মানবগণের নিকট নরবর, যুবতিগণের নিকট সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মদন, গোপগণের নিকট স্বজন, অসৎ নরপতিগণের নিকট শাস্তা, (শাসনকর্ত্তা) নিজ পিতা ও মাতার নিকট শিশু, ভোজপতি কংসের নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বানগণের নিকট বিরাট স্বরূপ, যোগিগণের নিকট পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের নিকট পরম দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরস-কদম্ব-মূর্ত্তি শ্রীভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, সখ্য, হাস্য, বীর, বাৎসল্য, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস শান্ত ও দাস্য—এই মুখ্য পাঁচ ও গৌণ সাতটী রসই তখন সর্ব্বরসময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তগণ আস্বাদন করিয়াছেন।

সর্ব্বোপনিষদের সারার্থ ভগবান্ নানাভাবে সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া লীলামাধুর্য্যে জগৎকে চমকিত করিয়াছেন।

পর্ব্বতের তুল্য শরীর চাণূরাদির নিকট অতি সুকুমার-সুশীতল-সুমধুর-অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ মহা কঠোর, ত্রাসোৎপাদক কটুতর বজ্রের মত প্রকাশিত হইলেন। মল্লগণের হৃদয় দ্বেষপূর্ণ ছিল, ইহাই তাহার কারণ। পিত্ত-দূষিত রসনায় মিশ্রিখণ্ড যেমন তিক্ত লাগে, ইহাও তেমনই। অসুরাবাসগণ দেবাদি-

রহিত বলিয়া তাঁহাদের শুদ্ধ সত্ত্বময় অন্তঃকরণে অতিশয় চমৎকারক রূপ, গুণ ও লীলাদিতে শ্রেষ্ঠরূপে প্রকাশ পাইলেন। তাঁহাদের বিস্ময়-রসটি জাগিয়া উঠিল। জননী প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত যুবতীগণ সাক্ষাৎ কামের মত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। (কৃষ্ণ-বিষয়ক-কাম বলিয়া এখানে প্রেম বুঝিতে হইবে।) প্রাকৃত কাম হৃদয়ে জাগরিত হইলে জীবকে নরকের পথে প্রধাবিত করে। কিন্তু এই অপ্রাকৃত কামের উদয়ে জীব প্রাকৃত কামের হস্ত হইতে চিরদিনের জন্য রক্ষা প্রাপ্ত হয়। প্রেমিকের চক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ,

"জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প
নাম ধরে মদন মোহন।"

তাঁহার মধুর রূপটি দর্শন করিলে কামের জ্বালা দূর হইবে, ইহাতে কথা কি? অবশে একটীবার মাত্রও তাঁহার নাম গ্রহণ করিলে রিপুগণ ভয়ে পলায়ন করেন। ঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন,

"আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব
সিংহরবে যেন করিগণ।"

এই অপ্রাকৃত মদনের যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা ধন্য। কামবীজ ও কামগায়ত্রীর দ্বারা ইঁহার পূজা করিতে হয়,

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কামগায়ত্রীতে যাঁর উপাসন।"
"পুরুষ যোষিত কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষান্মন্মথ মদন॥"

পিতৃগণ ও সখাগণ এবং অন্যান্য দর্শকগণ এইরূপ নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। কথায় বলে—কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন।"

শ্রীভগবানের এই ভক্তি-মুগ্ধতার অন্যতম একটী ঘটনা জলন্ত অক্ষরে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—

একদা দেবকী *-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হস্তীনায় গমন করিলেন। মহারাজাধিরাজ দুর্য্যোধন ষোড়ষ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। নিজ গৃহে ভোজনের প্রার্থনা জানাইলেন।

---

* দেবকী—যশোদার অন্যতম নাম।

"দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতিচ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দুর্য্যোধন! তুমিত আমার পর নহ। তোমার ঘরে খাইব ইহাতে কথা কি? চিরদিনই ত তোমার গৃহে খাইতেছি। অদূরে তোমার খুল্লতাত বিদুর বনে বাস করিয়া শ্রীভগবৎ-আরাধনা করিতেছেন। আমি আগে একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের পর্ণ-কুটীরে গমন করিলেন।

তখন সায়ংকাল। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইয়াছেন। অন্ধকার সর্ব্বত্র আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। বিদুর ফল অন্বেষণের জন্য বনে গমন করিয়াছেন। বিদুরের পত্নী জল আনিতে গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে বসিবার কোন আসন ছিলনা, ভূমির উপরই বসিলেন।

ক্ষণকাল পরই বিদুরের পত্নী জল লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, গৃহে যেন প্রদীপ জ্বলিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন। আলোর মাধুর্য্য দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, প্রদীপ নয়, মণির আলোতে ঘরখানি যেন উজ্জ্বল হইয়াছে। বিদুরের পত্নী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, পার্থিব মণি নহে, অভিনব নীলকান্ত মণি তাঁহার গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন। আঁধার বরণ কালরূপে তাঁহার আঁধার গৃহখানি আলোকিত হইয়াছে। নন্দরাণীর প্রাণের নীলমণিকে পাইয়া বিদুরের পত্নীর আনন্দের সীমা নাই। তিনি আনন্দে একান্ত অধীরা হইলেন।

বিদুরের পত্নীর এই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলনা। পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের লহরী উথলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যোগি-গণ ধ্যান করিয়াও যাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে কৃতার্থ হন, সেই যোগি-ধ্যেয় পাদপদ্ম যদি অযাচিত ভাবে স্বয়ং পদার্পণ করিয়াছেন, হায়! অভাগিনী আমি, তাঁহাকে কি দিয়া সুখী করিব? তাঁহাকে কি খাইতে দিব? একটী ক্ষুদের কণাও যে গৃহে নাই। হায়! দুর্ভাগিনী আমি করি কি?

বিদুরের পত্নী আকুলপ্রাণে ভাবিতে লাগিলেন। গৃহের এক কোণে অর্দ্ধ পক্ক একটী কদলী দেখিতে পাইলেন। ব্যস্ততার সহিত সেই কলটী গ্রহণ

করিলেন। সারভাগটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া কদলীর ছোলা শ্রীকৃষ্ণের বদনে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। কি করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেননা। তিনি যেন আর তাহাতে নাই। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত মনে অমৃত হইতেও পরামৃত জ্ঞানে ভক্তি প্রদত্ত সেই ছোলা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়, দূরবনে ফল সংগ্রহ করিয়া বিদুর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পত্নীর-কাণ্ড দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। নিতান্ত দুঃখিত মনে পত্নীর হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

বিদুর বলিলেন, অয়ি অবোধিনি, করিতেছ কি? মুনি-ঋষিগণ যাঁহার বদন কমলে হবি দিতেও কম্পিত হন, বুঝি বা কৃষ্ণের কোমল বদনে ব্যথা লাগে, তুমি কিনা তাঁহার বদনে কদলীর কর্কশ ছোলা তুলিয়া দিতেছ? হায়, জ্ঞানহীনা, তোমার হৃদয়ে কি একটুও লাগিতেছেনা? আমি যে এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আর দেখিতে পারিতেছিনা। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

পতির কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মাদিনী রমণীর জ্ঞান হইল। তাঁহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ভূমিতে পতিত হইয়া দেহ আছড়াইয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। নয়নের জলে পৃথিবী পঙ্কিল হইল।

শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, বিদুর একান্ত প্রিয়তম ভক্ত হইয়াও আমার হৃদয়ে এই শক্তিশেল কেন বিদ্ধ করিলে?

বিদুর, দ্রব্যেই কি আমার লোভ? যদি তাহাই হইত, তবে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্য্যোধন ত তাঁহার গৃহে ভোজন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি সেখানে ভোজন না করিয়া তোমার ক্ষুদ কণা খাইব বলিয়াই ত এখানে আসিয়াছি। দিব্য অন্ন ত সকলেই আমাকে খাইতে দেয়, কিন্তু তোমার প্রীতি-বাসিত ক্ষুদের কণা ত কোথায়ও পাই না।

আমি কতই না সাধে কদলীর ছোলা খাইতেছিলাম। অকস্মাৎ বাধা দিয়া তুমি আমার প্রাণে দারুণ ব্যথা প্রদান করিলে কেন? শ্রীকৃষ্ণ, বিদুরের পত্নী ও বিদুর—তিন জনেই কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্ত ও ভগবানের এই ক্রন্দনের মধুরতা বর্ণনার ভাষা নাই। ইহা মাত্র সহৃদয় ভক্তগণের অনুভবের বিষয়। ভক্তি-বশ্যতার এই প্রকার মধুর-দৃশ্য দর্শন করিয়া কাহার প্রাণ না

পুলকিত হয়? জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধানায় শ্রীভগবানের এই প্রকার কৃপা কখনই পাওয়া যায়না। ভক্তির মধুরিমা কি সুন্দর! এমন আনন্দকর ব্যাপার আর নাই। শ্রীভগবান্ আনন্দময়, ভক্তি সাধনটীও আনন্দ-পরিপূর্ণ। আনন্দের দ্বারা আনন্দময় শ্রীভগবানকে লাভ কতই না আনন্দের কথা। ভক্তি-সাধনের, আদি, মধ্য ও অন্তে, সর্ব্বত্রই কেবল আনন্দ। ভক্তের চরিত্র-আস্বাদনে তাঁহার ভক্তিভাব দর্শনে, মধুর বিনয় নম্র ব্যবহারে কেবল আনন্দ-রসেরই খেলা। নিম্নলিখিত ঘটনাটীতে ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য এবং শ্রীভগবানের অপার ভক্তবাৎসল্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা দ্বাদশী-তিথিতে মহারাজ অম্বরীষের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অম্বরীষ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক দ্বারা মহারাজোপচারে দুর্ব্বাসার অর্চ্চনা করিলেন। দুর্ব্বাসা মহারাজের ব্যবহারে সুখী হইলেন, বলিলেন—মহারাজ আজ আমি আপনার গৃহে দ্বাদশীর পারণ করিব।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তর দুর্ব্বাসা শিষ্যগণ-সহ আনাহ্নিক সমাপণের জন্য যমুনায় গমন করিলেন। যমুনার বিমল-শোভা-সন্দর্শনে একান্ত বিমোহিত হইলেন। শিষ্যগণকে লইয়া সন্তরণ করিতে লাগিলেন। পারণের কথা ভুলিয়া গেলেন।

অম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। মহর্ষি আসিতে বিলম্ব দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছেন না। পারণের সময় ক্রমেই অতিবাহিত হইতেছে দেখিয়া একান্ত চিন্তিত হইতেছেন। শাস্ত্র বলেন, একাদশী-অকরণে যেমন গুরুপত্নী-গমন, গো-মাংস ভক্ষণ এবং গুরুহত্যা প্রভৃতি নিদারুণ অপরাধ ঘটে, তেমনই দ্বাদশীর মধ্যে পারণ না করিলেও অপরাধ হইয়া থাকে।

মহারাজ অম্বরীষ অনেক ভাবনার পর পারণের নিয়ম রক্ষার জন্য এক-গণ্ডূষ জল হস্তে গ্রহণ করিলেন। জল ভক্ষণে একাদশী-ব্রত নষ্ট হয় না। দ্বাদশীর পারণও সিদ্ধ হইয়া থাকে। অম্বরীষ জল ভক্ষণ করিলেন, এমন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা স্নানান্তর সেথানে উপস্থিত হইলেন। অম্বরীষের হস্তে জল দর্শন করিয়াই দুর্ব্বাসা রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার জটা হইতে দুই অগ্নিবর্ণ মূর্ত্তি বহির্গত হইল। দুর্ব্বাসা অম্বরীষকে পরুষ-বাক্যে তিরস্কার

করিতে লাগিলেন। অম্বরীষ আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া একান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। মহর্ষির নয়ন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। দুর্ব্বাসা অম্বরীষকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন।

হঠাৎ ভীম-বিক্রমে সেখানে শ্রীভগবানের চক্রাস্ত্র উপস্থিত হইলেন। দুর্ব্বাসাকে বধ করিবার জন্য সবেগে তাঁহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। ভীতচিত্তে দুর্ব্বাসা নানা স্থানে যাইতে লাগিলেন। কোন স্থানেই আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারিলেননা। মহর্ষি ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা ভক্তদ্বেষী বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া অম্বরীষ শিবলোকে গমন করিলেন। দেবাদি-দেব মহাদেবও তাঁহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন একান্ত নিরুপায় হইয়া মহর্ষি ভগবৎ-চরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা জানাইলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মুনিবর, ইহা আমার সাধ্যাতীত। ভক্তের চরণে অপরাধ করিলে আমি তাহাকে মার্জ্জনা করি না। যাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছ, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কাতরপ্রাণে দুর্ব্বাসা বলিলেন, প্রভো! তাহা হইলে আর কিছুতেই আমার জীবন রক্ষা হইবে না। আমি সেখানে যাইবার আগেই চক্র আমাকে নিশ্চয়ই নিধন করিবেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, মুনিবর! তুমি অধীর হইও না। আমি চক্রকে বলিয়া দিতেছি, চক্র ততক্ষণ তোমার কোনই অপকার করিবে না।

শ্রীভগবানের স্নিগ্ধ-বাক্যে একটু ভরসা পাইয়া দুর্ব্বাসা অম্বরীষের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অম্বরীষ অনবরত শুধুই কাঁদিতেছেন। হায়! হায়! আমার দ্বারা অদ্য ব্রহ্ম-বধ হইল, আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

দুর্ব্বাসা ভক্ত-মহারাজ অম্বরীষের নিকট বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অম্বরীষ ইহাতে আপনাকে অধিকতর অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অম্বরীষ কাতরপ্রাণে চক্রের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন—"আপনি আমাকে বধ করুন, দুর্ব্বাসার দেহে কোনরূপ আঘাত করিবেন না। এই আমি মস্তক পাতিয়া দিতেছি।" অম্বরীষ চক্রকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। অম্বরীষের কাতরপ্রার্থনায়, চক্র দুর্ব্বাসা ঋষিকে ক্ষমা করিলেন। ভক্তের চরণে

অপরাধ করায় মুনিবর দুর্ব্বাসারও এই প্রকার শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে। এইজন্য শাস্ত্র ভক্তের-চরণে যাহাতে অপরাধ না জন্মে, সকলকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়াছেন। শ্রীহরির চরণে অপরাধ করিলে শ্রীহরিনাম সেই অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ ঘটিলে নিষ্কৃতির উপায় নাই,

হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তুয়া স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥

যাঁহার চরণে অপরাধ হয়, যদি তিনি ক্ষমা করেন, তবেই রক্ষা। নহিলে অন্য উপায় নাই।

এই ঘটনায় যোগী হইতে ভক্তের-শ্রেষ্ঠত্ব সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত।

জ্ঞানী "সোহং" "ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বলিয়া অভিমান করেন। প্রকৃতপক্ষে অতি সাধারণ বিষয়েও তাঁহার জ্ঞানের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না।

একজন রসিক ময়রা রসগোল্লার একটী থালা লইয়া জনৈক জ্ঞানীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাশয় বলুন ত আমার রসগোল্লাগুলি কেমন মিষ্ট?

ময়রার কথা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানী বলিলেন, তুমি কি আমাকে উপহাস করিতেছ? রসগোল্লা রহিল তোমার থালায়, আমি ঐ গুলি তিক্ত কি মিষ্ট কি করিয়া বলিব? যদি বলিতে হয়, তবে আমাকে খাইতে দাও। রসনার সঙ্গে যোগ না ঘটিলে তিক্ত কি মিষ্ট ইহা কি বলা যায়?

ময়রা হাসিয়া বলিলেন, মহাশয়, রসনার সঙ্গে যোগ না ঘটিলে যদি তিক্ত কি মিষ্ট কিছুই বলা চলে না, তবে শ্রীভগবানের কোন গুণের, কোন শক্তির কণা মাত্রও লাভ না করিয়া কি ভাবে "ব্রহ্মাস্মি" বলা যাইতে পারে?

রসিক ময়রার মিষ্ট-বচনে জ্ঞানীর যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি লজ্জা পাইয়া বদন অবনত করিলেন।

ময়রা আবার হাস্ত করিয়া মধুর-বচনে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়, আপনি আমার রসগোল্লাগুলি সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু দেখা বস্তু সম্বন্ধেও আপনার কোন প্রকার জ্ঞানের লেশ মাত্রও দৃষ্ট হইল না। ভগবৎ-ভক্ত কিন্তু ইহার একান্ত বিপরীত। শ্রীভগবান্ না দেখিয়াও সমস্ত ঘটনা যথাযথরূপে জানিয়া থাকেন। তিনি অন্তর্য্যামীরও অন্তর্য্যামিরূপে জীব-হৃদয়ে বাস করেন।

তাঁহাকে কেহই কখনও জানিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলের অবস্থাই বিশেষরূপে জানেন।

পিতামহ ভীষ্ম, অর্জ্জুনকে নিহত করিবার জন্য অগ্নি-বাণ যত্ন করিয়া তূণে রক্ষা করিলেন। ভীষ্ম ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রথে থাকিতে কিছুতেই অর্জ্জুনকে নিহত করা যাইবে না। আজ যুদ্ধ-শেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন রথ হইতে অবতরণ করিবেন, তখনই এই ভীষণ অগ্নিবাণে অর্জ্জুনের জীবন বিনষ্ট করিব।

যুদ্ধশেষে সারথি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমির উপরে আপন-হস্ত পাতিয়া থাকেন, রথী সারথির হস্তে পদার্পণ করিয়া রথ হইতে ভূমিতে অবতরণ করেন, ইহাই চির-প্রচলিত নিয়ম।

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই দিবস ভাঙ্গ করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, সখে! তুমিত চিরদিনই আমার হস্তে পদার্পণ করিয়া ভূমিতে অবতরণ কর। আজ অগ্রে তুমি রথ হইতে নামিয়া ভূমিতে হস্ত প্রসারণ কর, আমি তোমার হস্তে পদার্পণ করিয়া অবতরণ করিব। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐশ্বর্য্য-ভক্ত অর্জ্জুন একান্ত আনন্দিত হইলেন। ভূমিতে অবতরণ করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ভীষ্ম এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। অর্জ্জুনকে নিধন করিবার ইচ্ছায় ভীষণ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই অর্জ্জুন মনে করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বাণ ছাড়িলেন।

নব-জলধর সারথি শ্যামসুন্দরের অঙ্গে অগ্নিবাণ আপন-প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেন না। রসে ঢর ঢর শ্রীঅঙ্গের সুমধুর স্পর্শ পাইয়া অগ্নিবাণ হৃদয়ের অগ্নি জুড়াইলেন। আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। হাসিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, সখে কেমন? এখন তুমি রথে থাকিলে কেমন হইত? অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ভঙ্গী বুঝিতে পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ কৃপা অবলোকন করিয়া পাণ্ডবগণ একান্ত আনন্দিত হইলেন। সুখাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতে

লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সেই অশ্রুতে স্নান করিলেন। পাণ্ডবগণ বারম্বার শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ জুড়াইলেন।

এই ঘটনাটীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরব্রহ্মত্ব স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে। জ্ঞানীর কল্পিত ব্রহ্মত্ব কেবল কল্পনায়ই পর্য্যবসিত। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ ভক্তবাৎসল্যও এই ঘটনাটীতে সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তির কি অসাধারণ মহিমা, অর্জ্জুনের ভক্তি-গুণেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। আবার মৃত্যুর হস্ত হইতেও রক্ষা করিয়া ভক্তবৎসলতার মাধুরী জগতে জানাইয়াছেন।

আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমানের মত নিদারুণ অপরাধ দ্বিতীয় নাই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মরুদ্র সম।
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন।

দিনে যাহার দশ অবস্থা, তাহার মুখে "আমি ব্রহ্ম" কথাটী বড়ই অশোভনীয়। জ্ঞানী বলিয়া অভিমান পোষণ করিয়া অজ্ঞানের মত ব্যবহার নিতান্তই দুঃখের কথা।

জ্ঞানিগণ যে ব্রহ্মের আরাধনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তদপেক্ষা অতি উচ্চ তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন,

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্।"

ভক্ত নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত কখনই জ্ঞান-কর্ম্মাদির অপেক্ষা রাখেন না। বরং জ্ঞানাদির স্পর্শে ভক্তির শুদ্ধতার হানিই হইয়া থাকে। জ্ঞান-কর্ম্মাদি ভক্তির সাহায্য করিবে কি, তাহারা ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত আপনাপন ফল প্রদানেই একান্ত অসমর্থ।

ভক্তি, জ্ঞানের বা কর্ম্মের ফল উৎপাদনে কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা না করিয়াই তত্তৎফল প্রদান করেন।

ভক্তির কোন নিয়মেরই অপেক্ষা নাই। তিনি নিরঙ্কুশ। ভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্যই ঐ ভক্তির মূল প্রাণ। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির ন্যায় ভক্তি-যোগে অঙ্গহানি নিমিত্ত কখনও নিন্দাদি শ্রবণ করা যায় না। ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নয়ন মুদ্রিত অবস্থায় ধাবন করিলেও পতন ঘটে না। ফল কথা ভক্তির শরণ

যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রত্যবায়ী হইতে হয় না। তবে কোন প্রকারে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ না ঘটে, এই বিষয়ে সর্ব্বদাই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। অজ্ঞানকৃত অপরাধের মার্জ্জনা নামাশ্রয়ে সহজেই হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানকৃত অপরাধ-সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

সেবাপরাধ এবং নামাপরাধের মধ্যে নামাপরাধই অধিকতর গুরুতর। নামাপরাধের মধ্যে সাধুনিন্দা প্রথম অপরাধ। নিন্দা-শব্দে দ্বেষ এবং দ্রোহ প্রভৃতিও উপলক্ষিত হয়। শাস্ত্র বলেন, এই অপরাধ ঘটিলে, অনুতাপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"অগ্নিদগ্ধ-ব্যক্তি যেমন অগ্নিতেই শান্তি লাভ করে" এই ন্যায় অনুসারে, যাঁহার চরণে অপরাধ ঘটে, তাঁহাকে বিশেষ ভাবে স্তুতি ও প্রণতি প্রভৃতি দ্বারা ঐ অপরাধের ক্ষয় করিতে হয়।

অপরাধের অতি গুরুত্ব হেতু কোনরূপে তাঁহার (যাহার নিন্দা করা হইয়াছে) ক্রোধের নিবৃত্তি করিতে না পারিলে "আমি ভক্তাপরাধী, আমাকে ধিক্"—এই প্রকার নির্ব্বেদ সহকারে অবিচ্ছেদে নাম-সংকীর্ত্তনে রত হইতে হইবে। শাস্ত্রে নাম-সংকীর্ত্তনের বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রবণ করা যায়, মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,

"সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥"

ভগবৎ-ভজন-পরায়ণ-ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সাধু কিনা, এই প্রকার বিচার করিয়া যদি কেহ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচিত হন, তবে তাঁহাকে পরম দুর্ভাগা বলিতে হয়। সর্ব্বপ্রকার আচার-বিবর্জ্জিত, শঠতাপরায়ণ ও জগৎ-বঞ্চক হইলেও শ্রীভগবৎ-ভজন থাকিলে শাস্ত্র তাঁহাকে সাধু বলিয়া সমাদর করেন।

সাধুরা স্বয়ং দুর্জ্জন-ব্যক্তির অপরাধ গ্রহণ না করিলেও তাঁহাদের চরণ-রেণু-সমূহ ঐ অপরাধ সহ্য করেন না, সুতরাং সাধুব্যক্তি অপরাধ গ্রহণ না করিলেও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভক্তির প্রতি অবিশ্বাসের ফলেই আমরা সম্যক্ ফললাভে বঞ্চিত হইয়া

থাকি। "একটিবার নাম শ্রবণ করিলেও (বলা ত দূরের কথা) চণ্ডালব্যক্তিও সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করে" ইত্যাদি অসংখ্য প্রমাণ হইতে এবং অজামিলাদির উপাখ্যানে নামাভাসেরও অবিদ্যা পর্য্যন্ত সকল অনর্থের নিবৃত্তি স্পষ্ট রূপে জানা যায়। নামাভাসের (নামের নহে) ভগবৎ-প্রাপকত্ব অজামিলের উদ্ধারেই উপলব্ধি হয়। নামের এতাদৃশী মহিয়সী শক্তিতে সন্দেহ মাত্রও নাই। নামে অপরাধী ব্যক্তির সম্বন্ধে নাম নিজ-শক্তি প্রকাশ করেন না। এইরূপ হইলেও কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তির প্রতিও যমদূতের কোন প্রকার অধিকারই নাই।

ধনবান্-প্রভু যেমন সামর্থ্য থাকিলেও অপরাধী আত্মীয় ব্যক্তির প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করেন না, পরন্তু তাহার প্রতি ঔদাসীন্যই প্রকাশ করেন, ভক্তিতে অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও সামর্থ্য-সত্ত্বেও ভক্তি তেমনই কারুণ্য প্রদর্শন করেন না।

নিরপরাধ ব্যক্তি যদি ভজন কালে ফলপ্রাপ্ত না হন, তবে সে স্থলে ভক্তির-মাহাত্ম্যে সন্দেহ করা উচিত নহে। বৃক্ষ ফলিলেও যেমন যথাকালে ফলিয়া থাকে, তদ্রূপ নিরপরাধ ব্যক্তিকেও নাম সময় মতই ফল প্রদান করেন।

যাঁহারা ভক্তি-অঙ্গ যাজন করিয়াও নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করেন, তাঁহাদের প্রতি বিপরীত ভাব পোষণ সঙ্গত নহে। ভক্তির-কৃপায় ভগবৎ-অনুগ্রহ ঘটে। শ্রীভগবান্ যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তাঁহার ধনাদি ক্রমে সব নষ্ট হইয়া যায়। সে ব্যক্তি নির্ধন হইলে স্বজনগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ভগবৎ-বাক্যই এই বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ,

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনো দুঃখদুঃখিতমিতি॥"
"নির্ধনত্বং মহারোগো মদনুগ্রহলক্ষণ" ইত্যাদি।

জ্ঞান-যোগাদিতে অভ্যাসকালে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, পরে ফল-প্রাপ্তিতে দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানের ফল আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি, কিন্তু সুখ-প্রাপ্তি নহে।

ভক্তির মধুরতার কথা ভাবিলে হৃদয় আনন্দে অধীর হয়। ভক্তি-সাধন অনুষ্ঠান মাত্রই (প্রথমাবস্থায়ই) সাধক সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

ভক্তির উদয়ে সাধক এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-লাভ করেন। মরুভূমি হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তি মন্দাকিনীর অমৃত-প্রবাহে বিধৌত, নিবিড়তর শাখা-প্রশাখা সমন্বিত প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষের সুশীতল ছায়া প্রাপ্ত হইলে যেমন আনন্দিত হইয়া থাকেন, ভক্তির-মধুরতায় ভক্তও তেমনই আনন্দ লাভ করেন। পণ্ডিত-গণ এই আনন্দের পরিমাণ করিতে পারেন না। দাবানল-নিপীড়িত বন্য-হস্তী যেমন জলধরের সুশীতল ধারা প্রাপ্ত হইয়া শীতল হন, ভক্তও তেমনই ভক্তি-রসে অভিষিক্ত হইয়া চির-শীতলতা লাভ করেন। ভব-দাবানলের নিদারুণ জ্বালায় তাঁহাকে আর জ্বলিতে হয় না।

জ্ঞানী মাত্র দুঃখ-নিবৃত্তিতেই কৃতার্থতা বোধ করেন, ভক্তের কিন্তু দুঃখ-নিবৃত্তি আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া থাকে। দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে ভাবিতেই হয় না। পরমানন্দ-লাভই ভক্তির মুখ্য ফল। ভক্ত আবার এই আনন্দও শ্রীভগ-বৎ-চরণে প্রার্থনা করেন না। বিনা প্রযত্নেই এই আনন্দ-লাভ হইয়া থাকে। আনন্দ যেন ভক্তকে সেবা করিয়া আপনি কৃতার্থ হইতে চাহেন। ভক্তি-সুখের নিকট কোটী ব্রহ্মসুখ সমুদ্রের নিকট গোষ্পদের তুল্য,

"কৃষ্ণ-নাম আস্বাদনে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥"

ভক্তি-সুখ অপরিমিত। ইহা নিত্যই নূতন, "নব রে নব নিতুই নব।"

নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবশে যদি কখনও সাধু-সঙ্গ লাভ হয়, তবেই ভক্তি-যোগে প্রবৃত্তি জন্মে। তখনই প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে সাধক শ্রীভগবদ্ভক্তিতে অনুরাগী হইয়া থাকেন। চরম জন্মেই ভক্তিতে প্রবৃত্তি ঘটে। ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ভক্তিমান্ মহাত্মা সচরাচর দেখা যায় না। ত্রিজগতে ভক্তই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ-বস্তু। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"॥

ভক্তি-সাধনে অপরিপক্ক অবস্থায় দেহত্যাগ ঘটিলে যদিও বা ভক্তের আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সেই জন্মও ভক্তের কর্ম্মফল-ভোগের জন্য নহে। ভক্তের কখনও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, তবে যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যাদি

কখনও দেখা যায় তাহা উৎপাত-দন্ত-সর্পের দংশনের মত। বিষদন্ত-বিহীন আশীবিষ দংশন করিলেও যেমন বিষক্রিয়া প্রকাশ পায় না, তেমনই ইন্দ্রিয়-দোষে আক্রান্ত ভক্তও কোন প্রকার প্রমাদগ্রস্ত হন না। অনুতাপানলে তাঁহার দোষসমূহ দগ্ধ হইয়া যায়।

ভক্ত, সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণের আলয় হইলেও দীনাতিদীনের মত জীবনযাপন করেন। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীভগবৎ-পদারবিন্দের মধুর মকরন্দ আস্বাদনে কৃতার্থ হন। ক্ষান্তি ও বৈরাগ্যাদি অত্যুত্তম গুণসমূহ ভক্ত-চরিত্রে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ জনগণ ভক্তের ভাব বুঝিতে পারেন না, তবে সাধু-গোষ্ঠীতে পরম পূজ্যতমরূপে তিনি সমাদৃত হইয়া থাকেন। ভক্তির ফলে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া কোটিচন্দ্রের উদয়ে যেমন সুশীতল হওয়া যায়, ভক্ত তেমনই সুশীতল হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ প্রেমিক-ভক্তের নয়নগোচর হইয়া স্বীয় অপার-সৌন্দর্য্য ও কারুণ্যাদি গুণসমূহকে তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করেন। শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ অজের অজেয় হইলেও ভক্ত-কর্ত্তৃক জিত হইয়া থাকেন। ভক্তের নিকট তিনি সর্ব্বদাই পরাজিত।

ভক্তির মধুর স্পর্শগুণে স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের মত মনুষ্যের ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাকৃতত্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তির প্রভাবে ভক্ত চিরকাল পরমা শান্তিলাভে কৃতার্থ হন।

ভক্তির উদয়ে জ্ঞান-সাধ্য-মোক্ষও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, এইজন্য ভক্তিকে মোক্ষলঘুতাকৃত বলা হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের এবং তদীয় ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। শ্রীভগবান্ উহা আশু দান করেন না বলিয়াই ভক্তিকে সুদুর্ল্লভা বলা হয়।

ভক্তির আবার নানা প্রকার শ্রেণী-বিভাগ আছে, সকাম ও নিষ্কাম-ভক্তি। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। স্বর্গাদি বিষয়-ভোগই সকাম-ভক্তির ফল। আর্ত্ত ও অর্থার্থী-জনই এই ভক্তির অধিকারী। নিষ্কামা-ভক্তির অপর নাম সাত্ত্বিকী-ভক্তি। কর্ম্মমিশ্রা এবং জ্ঞানমিশ্রাদি ভক্তির আরও বহুতর ভেদ আছে। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিকট এই ভেদগুলি বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন প্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে ভগবৎ-ভক্তি, তাহাকে সকাম-ভক্তি

বলে। ধ্রুব-মহাশয়, রাজ্যলাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। কামনা পূরণের জন্য ভগবদ্ভক্তি করিলেও পরিণামে আর কামনা থাকে না, তখন ভগবৎ-দাস্য লাভের ইচ্ছায়ই প্রাণ আকুল হইয়া থাকে,

"কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে করে অভিলাষে॥"

মহাত্মা ধ্রুব, শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, "প্রভু হে! বিষয়-লাভের জন্য ভক্তি করিয়াও আমি যোগীন্দ্র এবং মুনীন্দ্রগণেরও দুর্লভ তোমাকে পাইয়াছি, কাচ অন্বেষণ করিয়া কাঞ্চন প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি আর রাজ্য প্রার্থনা করি না,

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্র-গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

সকাম-ভক্তির ফলেও পরিণামে বিশুদ্ধা ভক্তি প্রাপ্তি ঘটে। তখন তিনি প্রাণের যাবতীয় বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-চরণ সেবার অভিলাষী হইয়া থাকেন। ইহার কারণ, নিখিল গুণাধার, পরম করুণাপরাবার শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের অপার করুণা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণ স্বগুণে শ্রীচরণকমলের সেবা প্রদান করিয়া সকাম ভক্তকেও কৃতার্থ করিয়া থাকেন,

"কৃষ্ণ কহে, আমা ভজি মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি, বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ছোঁড়াইব॥

শ্রীভগবৎ চরণ প্রাপ্তি ব্যতীত কামনা না থাকিলেই তাহাকে নিষ্কাম-ভক্তি বলে।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা-ভক্তিকে সাধন-ভক্তি বলে। সাধন ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানে ভাব অঙ্কুরিতা হইলেই তাহাকে ভাব ভক্তি বলে। ভাব-ভক্তির প্রগাঢ়তর অবস্থার নাম প্রেম-ভক্তি।

সাধন-ভক্তি আবার বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্র-শাসনের ভয়ে নরকাদি হইতে উদ্ধারের জন্য যে ভক্তিতে প্রবৃত্তি, তাহাকে বৈধী-ভক্তি বলে,

"সেই ত সাধন-ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধী-ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী-ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"

বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। সকল প্রকার বিধি ও নিষেধ ঐ দুইয়ের (স্মরণ ও বিস্মরণের) অধীন।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন অবশ্য কর্ত্তব্য। চারিবর্ণাশ্রমী স্বধর্ম্ম পালন করিয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিমুখ হন, তবে অবশ্য তাহার নরকে পড়িতে হয়,

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও রৌরবে পড়ি মজে॥"

ভীতির সহিত বিধির অধীন হইয়া যে ভজন তাহাকে বৈধী-ভক্তি বলে। প্রায় সমগ্র জগৎই এই বিধি-ভক্তি করিয়া থাকেন, এই ভক্তিতে ব্রজপ্রেম-লাভ ঘটে না,

"সকল জগৎ মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজের ভাব পাইতে নাই শক্তি॥

বিধি-ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাতিশয় দৃষ্ট হয় না। রাগানুগা-ভক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণের পরম অভিনিবেশ। অন্যবিধ সাধন (জ্ঞান-যোগাদি) ত দূরের কথা, বৈধী-ভক্তিও শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারেন না। বৈধী-ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে আমার করিয়া লইতে পারেন না, তবে তিনি নিজে শ্রীভগবানের হইয়া যান। বৈধী-ভক্তিতে তদীয়তা জ্ঞান, মদীয়তা-ভাব বৈধী-ভক্তিতে দৃষ্ট হয় না। কারণ, মদীয়তা-ভাবটী সঙ্কোচহীন মধুর ভালবাসায় হইয়া থাকে। শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণের মধ্যে এই মদীয়তা-ভাবটী দেখা যায়।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান ও মাধুর্য্য-জ্ঞান দুইটী কথা। শ্রীভগবান্ বড়, আমি ছোট, এইটী ঐশ্বর্য্য-ভাব। আর শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া যে ভালবাসা, তাহার নাম মাধুর্য্যভাব।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, আমাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নিজকে হীন জ্ঞানে ভজন করিলে প্রেমবশ তিনি বশীভূত হন না,

"আমাকে ত বড় মানে আপনাকে হীন।
তার "প্রেমবশ আমি" না হই অধীন॥"

এই পয়ারটীতে অপূর্ব্ব-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে পদটী একান্ত সরল বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু ইহার অর্থ-সঙ্গতি বড়ই দুরূহ ব্যাপার। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সংস্কৃত টীকায় এই পয়ারটীর অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যতীত বঙ্গভাষার অন্য কোন গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা নাই। শ্রীচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা করিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ বঙ্গভাষার প্রতি অপূর্ব্ব সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত দার্শনিক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি ভক্তি-জগতের গৌরবের বস্তু। দার্শনিক-তত্ত্ব সরলভাবে সরল-ভাষায় প্রকাশ এই গ্রন্থের একতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীগ্রন্থখানিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে অভিনব রস-তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছেন, এমন আর অন্য কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রতিটী পয়ারই বড়ই মধুর। একদিকে যেমন অপূর্ব্ব সুমিষ্ট ভাষা, অপরদিকে আবার অতি গভীর ভাব। ভাষা এবং ভাবের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখা যায় না।

উপরোক্ত "তার প্রেমবশ আমি না হই অধীন।" প্রেমবশ—কিন্তু অধীন নহে, এই প্রকার অর্থের কিছুতেই সঙ্গতি হইতে পারে না। প্রেমবশ আমি তার অধীন হই না, চক্রবর্ত্তিপাদ এই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই প্রেমের একান্ত বশীভূত। অন্যান্য সাধনে (জ্ঞান যোগাদিতে) তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু বশীভূত করা যায় না। শ্রীভগবানের অধীন হওয়া যায়, কিন্তু শ্রীভগবানকে অধীন করা যাইতে পারে না,

"জ্ঞানে, যোগে, কর্ম্মে কভু নহে কৃষ্ণ বশ
কৃষ্ণবশ হেতু এক নাম প্রেম রস।"

ভক্তিরস পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহার মধ্যেও আবার মধুর-রসেই শ্রীকৃষ্ণ সমধিকরূপে বশীভূত হইয়া থাকেন।

সখ্যরসে শ্রীভগবান অধীন হইয়া থাকেন, বাৎসল্যরসে ভৃত্যের মত আজ্ঞা বহন করেন। মধুর-রসে সর্ব্বতোভাবে ভক্তের হইয়া যান। এই সমস্তই একমাত্র ব্রজে দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ একদিন সখাগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীড়ায় পরাজিত-

দল বিজয়ীকে স্কন্ধে লইয়া কদম্বমূলে রাখিয়া আসিবেন, এই পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইয়াছে। একদলে বলরাম, সুদাম প্রভৃতি। অন্যদলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদাম প্রভৃতি। একদলে প্রধান বলরাম, অন্যদলে শ্রীদাম। শ্রীদাম খেলায় বলরামকে প্রায় পরাজিত করিয়াছেন, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য সখাগণকে লইয়া শ্রীদামের পশ্চাৎ হইতে সরিয়া গেলেন। অসহায় শ্রীদাম খেলায় পরাজিত হইলেন। বলরাম শ্রীদামের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। শ্রীদাম অতি কষ্টে বলরামকে কদম্ব-মূলে রাখিয়া আসিলেন।

পরদিন আবার পূর্ব্বভাবে পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইল। শ্রীদাম আর সেদিন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে গেলেন না, বলরামের পক্ষে রহিলেন। সেদিন খেলায় শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইলেন। বিজয়ী শ্রীদাম বীরদর্পে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু শ্রীদাম কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদামকে স্কন্ধে লইয়া কদম্ব-মূলে রাখিয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে প্রেমবশ্যতা প্রকাশ করিলেন। সখ্যরসে সমজ্ঞান, তাহাতেই শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। সখ্যরসের ভাব,

> "কান্ধে চড়ায় কান্ধে চড়ে করে ক্রীড়া রণ।
> তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥"

বাৎসল্য-রসে মমতাতিশয্য। যশোদা কখনও বা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করেন কখনও বা তিরস্কার করেন। কখনও বা অতিশয় হীন মনে করিয়া লালন করিয়া থাকেন,

> "মাতা মোরে হীন ভাবে করয়ে র্ভৎসন।
> অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥

দাম-বন্ধনাদি লীলায় এই সমস্ত স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। বাৎসল্য-রসে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। একদিন মা (যশোদা) বলিলেন, বাবা, গোপাল! ঐ উদুখলটী আনয়ন কর। শ্রীকৃষ্ণ উদুখলটী লইয়া আসিলেন।

মহারাজ নন্দ একদিন বলিলেন, বাছা, বাল গোপাল! আমার বাধা

(পাদুকা) লইয়া আইস। পিতৃ-আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণ পাদুকা হস্তে লইলেন, বক্ষে ধারণ করিলেন, তৎপর মস্তকে লইয়া পিতৃচরণে উপনীত হইলেন। নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইলেন।

মধুর রসে কেবলই মধু। মধুর মত মধু (মিষ্ট) নাই, মধুর রসের মত মধুর ও আর দেখা যায়না। শ্রীরাধাদি গোপীগণ প্রেম-বিহ্বল অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে র্ভৎসনা করেন, এই র্ভৎসনাকে শ্রীকৃষ্ণ কোটী অমৃত মনে করিয়া নিষেবন করিয়া থাকেন। গোপীগণের তিরস্কার-বাক্য শ্রীকৃষ্ণের যেমন মধুর লাগে, বেদস্তুতিও তেমন লাগেনা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে র্ভৎসন।
বেদস্তুতি হতে অধিক হরে মোর মন" ॥

গোপাঙ্গনার তীব্র র্ভৎসনায় শ্রীকৃষ্ণেরযে আনন্দাতিশয়, তাহার তুলনা নাই। সুমধুর স্তুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ কখনই এই প্রকার আনন্দ লাভ করেন না।

শ্রীমতী, একদিন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে নিকুঞ্জকাননে সারাটি রজনী জাগাইয়া কাটাইতেছেন। আসিবেন বলিয়াও আসিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতী অত্যন্ত আকুলিতা হইয়াছেন। অল্পরাত্রি থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জে উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবা মাত্রই শ্রীমতীর মানাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সখীগণও আবার সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন, মানিনী মানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন।

মান, বড়ই সুন্দর বস্তু। নায়কের প্রাণ মজাইতে, নায়ককে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে, এমন আর নাই। প্রাকৃতজগতে প্রকৃত মান দেখা যায়না। নায়ককে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভাবিতে না পারিলে প্রকৃত মানের উদয় হয়না। শ্রীকৃষ্ণ, প্রথমতঃ মানিনীর মানভরে অবনত বদনের সুমাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, অচিরেই মানিনীর মান-সাগরে যে উত্তাল-তরঙ্গ উঠিবে, তাহার বেগ তিনি কিছুতেই ধারণ করিতে পারিবেন না।

অচিরেই মানসাগরে বিপুল তরঙ্গ উঠিল। গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ তৃণের মত সেই তরঙ্গে ডুবিতে ও ভাসিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কাতর বাক্যে শ্রীমতীকে কত বিনয় করিলেন, কিন্তু মানিনীর মান ভাঙ্গিল না। শ্রীকৃষ্ণ যত সাধিতে লাগিলেন, শ্রীমতীর দুর্জ্জয় মান ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীমতী ক্রমেই ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িলেন —অবশেষে প্রিয় সখীকে বলিলেন, সখি! শ্যামসুন্দরকে নিকুঞ্জ হইতে দূর করিয়া দাও, আমি কিছুতেই তাহার বদন আর নিরীক্ষণ করিবনা। সখি! কাল-রূপে হৃদয় দিয়া আমি আর হৃদয় কাল করিবনা। আমি আর কাল হেরিব না। আমি আর কালিন্দির জলে যাইব না। আমি আর নীল আকাশের দিকে তাকাইবনা। আমি আর ময়ূরের কণ্ঠ দর্শন করিব না। সখি আমি আর কাল কেশ রাখিব না। আমি আর নয়নে অঞ্জন মাখিব না। সখি! কাল ভাবিয়া আমি সোনার অঙ্গ কাল করিয়াছি কাল ভাবিয়া আমি আর কাল হইব না। সখি! তোমাকে বারম্বার বলিতেছি, সত্বর তাহাকে কুঞ্জ-গৃহ হইতে বাহির করিয়া দাও, মুহূর্ত্ত ও বিলম্ব করিওনা,

"বের ক'রে দেগো সই শ্যামল সুন্দর।
আমি হেরব না, হেরব না, হেরব না সই তারে॥"

চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটী বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ ভাবে আদৃত হইয়াছে,

"বঁধু হে! কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিলাম প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥ ইত্যাদি

আমরা পূর্ব্বোক্ত "বের ক'রে দেগো"পদটি আস্বাদন করিতে ভক্ত-সাহিত্যিক-গণকে প্রার্থনা জানাইতেছি।

মধুর-রসে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার বশীভূত হন, তেমন অন্তরসে হননা। জ্ঞান-যোগাদি ত শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূতই করিতে পারেন না।

বৈকুণ্ঠ এমন কি গোলকধাম হইতেও মধুরতর লীলা-মাধুরী প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ভূমণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবন-লীলা প্রকট করিয়াছেন। প্রকট-লীলায় ব্রজে নিত্যই পরকীয়া-ভাব। পরকীয়া-ভাবে ই রসের অপূর্ব্বতা। শ্রীবৃন্দাবনধাম ব্যতীত এই পরকীয়া-ভাবের প্রকাশ অন্যত্র নাই।

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

মহাভাববতী গোপীগণের যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম, তাহার তুলনা নাই।

দ্বারকায় রুক্মিণ্যাদি মহিষীবৃন্দে, মথুরায় কুব্জাদিতে এই জাতীয় প্রেমের লেশ-মাত্রও দৃষ্ট হয় না। ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমোৎকর্ষের তুলনা নাই। সর্ব্বত্রই আত্মসুখের কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু গোপীগণ আত্ম-সুখের বিন্দুমাত্রও অভিলাষ রাখেন না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য না করিতে পারেন, তাঁহাদের এমন কোন কার্য্য নাই। ব্রজ-প্রেমের অপূর্ব্ব মাধুরী সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আস্বাদন করা যাইতেছে।

একদিন দ্বারকায় রুক্মিণীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিয়াছেন। রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপী, গোপী বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রমেই গোপী-বিরহে একান্ত আকুল হইলেন। অনেকক্ষণ পর, বহু চেষ্টার পর শ্রীকৃষ্ণ ধৈর্য্য ধারণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহার রুক্মিণীদেবীর প্রাণে বড়ই লাগিল। পরদিন তিনি মানাগারে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টায়ও রুক্মিণীর মান-ভঞ্জন করিতে পারিলেন না। একান্ত নিরুপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ একটী অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ-দেহে জ্বরের ভাণ করিতে লাগিলেন। ইহা সাধারণ জ্বর নহে, বিরহ-জ্বর। কিন্তু রুক্মিণী প্রভৃতি প্রকৃত তত্ত্বটী অনুভব করিতে পারিলেন না। জ্বর নিবারণের জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক্রমেই জ্বর প্রবল হইতে লাগিল। মহিষীগণ এবং দেবকী-মাতা একান্ত চিন্তিত হইলেন।

নারদঋষি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য প্রায় সর্ব্বদাই দ্বারকায় আগমন করিতেন। সেই দিনও আসিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণের দেহে জ্বর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদের প্রতিও মায়া বিস্তার করিলেন। দারুণ যন্ত্রণার ভাণ করিতে লাগিলেন।

নারদঋষি, দেবকী-মাতা এবং মহিষীবৃন্দকে কোন ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবকী বলিলেন, বৎস, অনেক ঔষধই সেবন করান হইয়াছে, কিন্তু রোগ হ্রাস না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

নারদ শ্রীকৃষ্ণকে জ্বর নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, স্ত্রীলোকের পদধূলী ব্যতীত অন্য কোন ঔষধেই আমার জ্বর যাইবে না। নারদ রুক্মিণীর নিকট পদধূলী প্রার্থনা করিলেন। রুক্মিণী বলিলেন, নারদ, বলিতেছ কি, পত্নী হইয়া পতির মস্তকে কি করিয়া পদধূলী দিব? তাহা হইলে যে অনন্তকাল নরক-ভোগেও এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। নারদ অন্যান্য মহিষীগণের নিকটও ধূলী প্রার্থনা করিলেন। সকলেই একই কথা বলিলেন, "পতিকে কি করিয়া পদধূলী দিব? তাহা হইলে যে অনন্তকাল নরক-ভোগেও এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

নারদ, অগত্যা দেবকী-মাতার চরণে পদধূলীর প্রার্থনা জানাইলেন। দেবকী বলিলেন, বৎস নারদ, তোমাদের মুখে যেদিন হইতে কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া শুনিয়াছি, সেইদিন হইতে আমারও অপরাধের ভয় হইতেছে। পদধূলী দিবার আমার সাহস হইতেছে না।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, নারদ এইখানে ত ধূলি পাইলে না। ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিয়া দেখিয়া আইস, কৃষ্ণ-দুঃখে কেহ দুঃখী আছে কিনা? আগে ব্রজে যাইও না। অন্য কোথায়ও ধূলী না পাইলে সর্ব্বশেষে ব্রজে গমন করিও।

নারদ, ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও পদধূলী পাইলেন না। সকলেই তাঁহাকে বলিতে লাগিল, নারদ, বৃদ্ধ হইলে বুদ্ধি থাকে না, ইহা সত্য কথা। গোলোক-পতির জন্য পদধূলী চাহিতেছ, ধিক্, তোমার মূঢ়তাকে শত ধিক।

নারদ অগত্যা ব্রজে গমন করিলেন। যমুনার তরঙ্গ দেখিয়া ভীত হইলেন। যমুনায় এত জল ও এমন তরঙ্গ তিনি কখনও দেখেন নাই। অতি কষ্টে যমুনা পার হইয়া নারদ ব্রজে প্রবেশ করিলেন। ব্রজের আর সেই শোভা নাই। শ্রীবৃন্দাবন যেন সাধারণ বনের মত হইয়াছেন। বনে ফল নাই, ফুল নাই। ময়ূর ময়ূরী আর তমালে তমালে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচে না। ভ্রমর আর মধুর গুঞ্জন করে না। পিক-বধূর মুখে আর সেই মধুর পঞ্চম ধ্বনি নাই। শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষসমূহ মৃত তুল্য। কেবল একটী মাত্র বৃক্ষ ব্রজের বক্ষে অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত। নারদ ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। ব্রজবাসিগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রজবাসিগণ বলিলেন, ইহার নাম

শোক-তরু। শ্রীকৃষ্ণ যে দিন শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় যান, সেই দিন নিজ হস্তেই তরুটী রোপণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রোপিত তরু বলিয়া ব্রজবাসিগণ বড়ই যত্নের সহিত ইহার মূলে সর্ব্বদাই জল সিঞ্চন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্রজবাসী সকলেই জ্ঞানহারা। এক ঘটী জল আনিয়া দিবার কাহারও শক্তি নাই। সকলেই এই তরুটীর মূলে বসিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এই জন্যই এই শোক-তরু এমন মনোহর শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দেখুন, গোপীগণের নয়ন-জল প্রবলবেগে যমুনায় গিয়া পড়িতেছে। নারদ যমুনার জল বৃদ্ধির কারণ বুঝিতে পারিলেন।

নারদের আগমন-সংবাদ মুহূর্ত্ত-মধ্যেই ব্রজে প্রচারিত হইল। ললিতা শ্রীরাধাকে, বিশাখা চিত্রাকে এইরূপে এক গোপী অন্য গোপীকে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, দেবর্ষি নারদ আসিয়াছেন, চল, তাঁহাকে দেখিতে যাই। বোধ হয় আমাদের সুদিন আবার আসিয়াছে। কৃষ্ণ বোধ হয় সত্বরই আগমন করিবেন, এই সম্বাদ দিতেই নারদকে পাঠাইয়াছেন। যে দিন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেও নারদাদি ভক্তবৃন্দ কেহই ব্রজে আসেন না। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই নারদ আসিয়াছেন।

গোপীকুল, একান্ত আকুলপ্রাণে দৌড়িয়া নারদের নিকট উপস্থিত হইলেন। ললিতা বলিলেন, নারদ! তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ ভাল ত? বহুদিন যাবত তাঁহার কোন বার্ত্তাই জানি না। তাঁহার কুশল সংবাদ বলিয়া প্রাণ জুড়াও।

নারদ, গোপীগণের অবস্থা দর্শন করিয়া কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ভাবিলেন, যদি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের অসুখের কথা বলি, তাহা হইলে হয়তঃ গোপীগণ প্রাণে বাঁচিবেন না। নারদ, কথাটী একটু রূপান্তর করিয়া বলিলেন, হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ ভালই, তবে—

নারদের কথায় বাধা দিয়া গোপীগণ বলিলেন, তবে কি, নারদ? তবে কি আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে? গোপীগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নারদ, অতিক্লেশে তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

নারদ বলিলেন, আপনারা ভাবিবেন না। পতকল্য তাঁহার দেহে জ্বরের প্রকাশ পাইয়াছে। ললিতা বলিলেন, গায়ে হাত দিয়া দেখ ত নারদ, আমাদের অঙ্গের তাপ হইতে কি তাঁহার অঙ্গে তাপ অধিক। নারদ, ললিতার দেহে হস্ত প্রদান করিলেন। তাঁহার হস্ত জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। ললিতা বলিলেন, নারদ, শ্রীকৃষ্ণ মাত্র একদিন জ্বরে ভুগিয়াছেন, আমরা যে চিরদিন বিরহ-জ্বরে পুড়িয়া মরিতেছি। নারদ, এই বিরহ-জ্বরের নিকট এই সামান্য জ্বর কি আসিতে পারে? যাউক, নারদ, আমাদের জন্য আমাদের ভাবনা নাই, তাঁহার জন্যই ভাবনা। নারদ, শ্রীকৃষ্ণের জ্বরের চিকিৎসা করান হইয়াছে কি? নারদ বলিলেন, হইয়াছে, কিন্তু ফল হয় নাই। রমণীর পদধূলী মস্তকে না দিলে তাঁহার জ্বর সারিবে না। ললিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, নারদ! রুক্মিণী সত্যভামা কি দ্বারকায় নাই। শুনিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের নাকি আরও অনেক মহিষী আছেন, সকলেই কি পিত্রালয়ে গিয়াছেন? নারদ বলিলেন, না, তাঁহারা সকলেই দ্বারকায়ই আছেন। গোপীগণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পদধূলী দেন নাই?

নারদ বলিলেন, মহিষীগণ নরকের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পদধূলী দিতে চাহেন না। গোপীগণ সমধিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, নারদ, মহিষীগণের এই প্রেমের বশীভূত হইয়া কি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছেন?

নারদ! ধূলী নিবার জন্য কি আনিয়াছ? নারদ বলিলেন, কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া কিছুই আনি নাই।

গোপীগণ গৃহ হইতে কৌটা আনাইলেন। যাঁহার পদে যত ধূলী ছিল, সব নিঃশেষে ঝাড়িয়া কৌটা পূর্ণ করিয়া নারদের হস্তে প্রদান করিলেন। নারদ অবাক্ হইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোপীগণ বলিলেন, নারদ, শীঘ্র দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধূলী প্রদান কর। আমরা অনন্তকাল অপরাধের ফলে নরক-বাস করিতে প্রস্তুত আছি, শ্রীকৃষ্ণ ভাল হউন। নারদ, শ্রীকৃষ্ণকে বলিও, গোপীগণ তিনি সুখী আছেন জানিলেই সুখী হয়। আত্ম-সুখ দুঃখের ধার তাহারা ধারে না। তবে আমাদের যে দুঃখ, ইহা কেবল তাঁহার দুঃখকে আমরা আপনার বলিয়া মনে করি।

নারদ, কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া গোপীগণের শ্রীচরণে বারম্বার প্রণামান্তর দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নারদকে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, জগতে কৃষ্ণ-দুঃখে প্রকৃত দুঃখী কেহ আছে দেখিলে কি নারদ? নারদ বলিলেন, না প্রভু, জগৎ ঘুরিয়া তোমার দুঃখে দুঃখী দেখিলাম না। তবে ব্রজ-গোপীর কথা বলিবার আমার ভাগ্য নাই। তাঁহারা সকলেই এই সমস্ত কৌটা ভরিয়া পদধূলী দিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, তুমি সুখী হইলে তাঁহারা নরকবাসেও দুঃখ অনুভব করিবেন না। তাঁহাদের কৃষ্ণ-প্রেমের পরিমাণ করিবার শক্তি আমার নাই।

গোপীর কথা শুনিয়াই শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলেন। নারদের হস্ত হইতে ধূলী লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন, বলিলেন, নারদ, জুড়াইলাম। বহুদিন পর আজ প্রকৃতই আমার দেহ শীতল হইল। নারদ, এই ধূলী ত্রিলোকে দুর্ল্লভ।

রুক্মিণীর অভিমান দূর হইল। তিনি বুঝিলেন, গোপী-প্রেমের তুলনা নাই। গোপী-প্রেম অনন্ত, অগাধ, পারাবারহীন। বড় বিশুদ্ধ, বড় উজ্জ্বল, বড়ই মধুর।

"আত্ম-সুখহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল প্রেম যেন দগ্ধ হেম॥"

দ্বারকাবাসিগণ অকৈতব গোপী-প্রেমের মধুরতা দেখিয়া বিস্মিত ও একান্ত মোহিত হইলেন। নারদ, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

ব্রজ-গোপীর আনুগত্যে মঞ্জরী-দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাই সাধন-রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা। ইহার নামই মধুর ভজন। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে ভজন করিলে গো-লোকে কিম্বা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই মধুরভাবে ভজন না করিলে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায় না।

"রাগানুগ ভক্তি বিনে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥"

প্রকট শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরকীয়াভাব। স্বকীয়া এবং পরকীয়া দুইটি কথা। কাত্যায়ণী-ব্রতপরা গোপাঙ্গনাগণের মধ্যে যাঁহাদের গান্ধর্ব্ব বিধানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ হয়, ব্রজে তাঁহারাই স্বকীয়া। অন্যা ধন্যাদি গোপকন্যাসকল ব্রজে পরকীয়া। শ্রীরাধাদি প্রৌঢ়া গোপীগণও পরকীয়া। দ্বারকা-ধামে রুক্মিণ্যাদি মহিষী-সকল স্বকীয়া। যাঁহাদের সঙ্গে যথাবিধি পরিণয়-কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাঁহারাই স্বকীয়া। আর যাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যথাবিধি পরিণয় হয় নাই, অন্য গোপের সঙ্গে যাঁহাদের পরিণয় হইয়াছে, তাঁহারাই পরকীয়া নায়িকা।

গোপীগণের অন্য গোপগণের সঙ্গে বিবাহ-ব্যাপারটী মুষল-লীলার মত মায়িক। শ্রীচরিতামৃত বলিতেছেন,

"মুষল লীলা আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইলা যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়।"

এই সমস্ত লীলার উদ্দেশ্য শুধু অসুরগণকে মোহিত করা।

প্রকৃত পক্ষে ব্রজ-গোপীগণের অন্য গোপগণের সঙ্গে বিবাহ হয় নাই। যোগমায়া লীলাপুষ্টির জন্য মায়া-গোপী-মূর্ত্তি সৃজন করিয়াই এই বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধাদি গোপীগণের বিবাহের প্রস্তাব স্থির হয়। হঠাৎ একদিন গর্গাচার্য্য ব্রজে আগমন করিয়া গোপীগণের পিতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের আসন্ন বিরহের কথা বলেন। তখন একান্ত বিষণ্ণবদনে গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের বিবাহের আলাপ প্রত্যাখ্যান করেন।

গর্গাচার্য্য গোপগণকে অতি সত্বরে অন্য গোপের সঙ্গে গোপীগণের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদনের কথা বলিলেন। কন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছেন, গর্গাচার্য্য ইঙ্গিতে এই কথাও গোপগণকে জানাইয়া দিলেন।

গোপগণ একান্ত নিরুপায় চিত্তে অন্য গোপের সঙ্গে আপনাপন কন্যাগণের বিবাহের দিন ধার্য্য করিলেন। এক দিবসেই সমস্ত গোপীগণের বিবাহের দিন স্থির হইল।

নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্ব-রাত্রিতে গোপীগণ একে একে যমুনার তীরে গমন করিলেন। একে অপরের যমুনাতীরে গমনের সম্বাদ জানিতেননা। যখন

সকলে একই স্থানে উপনীত হইলেন, তখন একজন অন্যজনকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি এখানে কেন? কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? অনেকক্ষণ কেহই কোন উত্তর দিলেন না। মনের দুঃখে কেবল আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হয় দেখিয়া আপনাপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন।

শ্রীরাধিকা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছিল। তাঁহার শ্রীচরণে রূপ যৌবন সবই মনে মনে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়, দারুণ বিধির সহ্য হইল না। তিনি অভাগিনীর সাধে বাদ সাধিলেন। মনে কত আশাই পোষণ করিয়াছিলাম, ভাগ্যদোষে সবই বিপরীত হইল,

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

সমস্ত গোপীগণ একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "আমারও ঐ কথা।" যদি জীবনের জীবন নীলরতনকেই পাইলামনা, তবে এই ছার প্রাণের প্রয়োজন কি? জীবন-ধনকে পাইবার কামনা করিয়া জীবনে জীবন বিসর্জ্জন দিব। মরিয়া বাঁচিব। চিরদিনের মত অমর হইব। প্রাণের জ্বালা শীতল যমুনা-জলে জুড়াইব। আর এক মুহূর্ত্ত ও দাঁড়াইব না। এই বলিয়া বিরহিণী গোপীগণ উন্মাদিনীর মত দৌড়িয়া যমুনার জলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হঠাৎ কোন গোপী বলিলেন, মরিব ত, কিন্তু একটী কথা। মরণের মত দারুণ কষ্টের ব্যাপার আর দ্বিতীয় নাই। যখন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন হয়ত আবার তীরে উঠিয়া আসিব। চল, এমন করিয়া সকলে অগ্রসর হই, যদি কেহ ফিরিতে চাই, তখন অপরে যেন ধরিয়া রাখিতে পারে। চল, আমরা একে অপরের হস্ত ধারণ করিয়া যমুনার জলে ঝম্প প্রদান করি।

গোপীগণ একে অপরের হস্ত ধারণ করিলেন। ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নীরব রজনী, কেবল নির্ম্মল সলিলা তটিনী কুলু কুলু স্বরে সাগরাভিমুখিনী। গোপীগণ বলিলেন, যমুনে! তুমি আকুল প্রাণে প্রবাহিতা

হইতেছ "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা সুন্দর তটশালিনী যমুনে গো" আমাদিগকেও তোমার সঙ্গিনী কর। আমরাও কোনদিন কৃষ্ণ-সাগরে পড়িতে পারি কিনা, দেখি। তটিনী, ওগো পতি-সোহাগিনী, চির কাঙ্গালিনী আমাদের প্রতি ফিরিয়া চাও। তটিনী, ওগো, প্রেমপাগলিনী আমাদিগকে ফেলিয়া একাকিনী যাইওনা।

বিরহিণী গোপ-কিশোরীগণ যমুনার জলের দিকে যাইতে লাগিলেন। বোধ হইল চঞ্চলা চপলা মালা যেন বিচ্ছিন্ন হইবার ভয়ে ধরাধরি করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছেন। অথবা স্বর্ণ-কমলিনীগণ যেন সারি সারি অগ্রসর হইতেছেন। গোপীগণ জলে অবগাহন করিলেন। তাঁহাদের প্রাণ সুশীতল জল-স্পর্শে আরও জ্বলিয়া উঠিল। ধিকি ধিকি তাঁহাদের দুঃখানল বর্দ্ধিত হইল। কোটী বাড়বানলের জ্বালা হইতেও তাঁহাদের দুঃখ-জ্বালা অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বর্গে অমরগণ কাঁপিয়া উঠিলেন। গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ চমকিত হইলেন।

সুনীল আকাশে চন্দ্রমা মধুর সুষমা বিস্তার করিতেছিলেন। চন্দ্রমা যেন হাসিতেছিলেন, সেই হাসিতে যেন কতই না সুধারাশি ঝরিতেছিল। কালিন্দীর কাল জল চাঁদের কিরণে উচ্ছ্বলিত হইতেছিল। যমুনার সৈকতভূমি রৌপ্যের মত ঝলমল করিতেছিল। চন্দ্রেরও আর এই নিদারুণ দুঃখ সহ্য হইলনা। তিনি রজনী প্রভাতের ছলে যেন আত্মগোপন করিতে লাগিলেন। অরুণ স্বাভাবিক অরুণরূপে উঁকি দিলেন, কিন্তু তাঁহার বদনও যেন আজ বিমলিন। মেঘের কোলে তিনিও লুকাইলেন। মেঘও আর এই নিদারুণ দৃশ্য দর্শন করিতে পারিলেন না। তিনিও গলিয়া পড়িলেন। বারি-পাতে যমুনার জল বৃদ্ধি হইল, ভীষণ তরঙ্গ উঠিল। যমুনা যেন আজ বিশ্ব গ্রাস করিবেন, বোধ হইতে লাগিল। যমুনা যেন ভাবিলেন, যদি গোপীগণ প্রকৃতই জীবন বিসর্জ্জন করেন, তবে আর বিশ্ব থাকিয়া ফল কি? ধরণী, তুমি রসাতলে যাও। চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহমণ্ডলী কক্ষচ্যুত হও। একে মেঘের জল, আবার গোপীগণের নয়নজল, যমুনার জল কেবলই বাড়িতে লাগিল। তরঙ্গের ছলে যমুনা যেন আছড়াইয়া নিজ দেহ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলেন। যমুনা ভাবিলেন, আমি আগে মরিব, এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিব না।

গোপীগণ ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর জলে অবগাহন করিতে লাগিলেন। আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইলেন। ডুবিতে চাহিলেন, কিন্তু তরঙ্গ ডুবিতে দিলনা। জলের উপর ভাসাইয়া রাখিল। অসংখ্য স্বর্ণকমলিনী-শ্রেণী জলে ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল। গোপীগণ ডুবিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ডুবিতে পারিলেন না।

"ওগো প্রেমোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ, কর কি? ডুবিও না। ব্রজের সুখসূর্য্য অস্তমিত করিও না। তোমরা না থাকিলে সুখের আর কি থাকে গো? তোমরা যে সুখের মূল প্রস্রবণ। তোমরা যে সুখের ও সুখ। তোমাদের দ্বারাই যে সুখরূপ-কৃষ্ণ সুখ-আস্বাদন করেন। আমার মাথা খাও ফিরিয়া চাও। ডুবিও না, গোপীগণ, ব্রজলীলা অতলজলে ডুবাইও না।" এই বলিয়া পশ্চাৎভাগ হইতে এক বর্ষীয়সী রমণী গগণ-ভেদী-স্বরে আকুলপ্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। তখন সেই তটিনীর চতুর্দ্দিক ভরিয়া কেবল প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, "ডুবিও না, ডুবিও না।" পৃথিবী, আকাশ, জল, স্থল সেই স্বরে কম্পিত হইতে লাগিল।

দিক্‌দিগন্ত-ব্যাপী সেই আকুল আহ্বান গোপীগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। গোপীগণ চমকিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলেন না।

আবার বামা-কণ্ঠে গভীর ধ্বনি হইল, "ডুবিও না, মধুর ব্রজলীলা অতল জলে ডুবাইও না। আর অগ্রসর হইও না; তীরে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

গোপীগণ কে ডাকিতেছেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। একজন গোপী বলিলেন, কে মা তুমি? আমাদের সুখের পথে, কে মা তুমি বৈরী হইলে? আমরা ত বড়ই গোপনে আসিয়াছিলাম, কেহই ত আমাদের মনের কথা জানিত না। কে, কে মা তুমি অন্তর্য্যামী? কেন আমাদের সুখের পথে কণ্টক হইতেছ? তখন সেই বামা-কণ্ঠে আবার উচ্চধ্বনি উঠিল। সে ধ্বনি বড় মধুময়। বড়ই আশ্বাস-পূর্ণ। সেই রমণী বলিলেন, তোমরা আমায় জান না? আমি তপস্বিনী, সান্দিপনি-মুনির জননী, নাম পৌর্ণমাসী।

গোপীগণ বলিলেন, ব্রজবন্দ্যে! মা, তুমি এখানে কেন? তোমার অভাগিনী কন্যাগণকে কি মৃত্যুকালে দেখা দিতে আসিয়াছ? মা, ফিরিয়া যাও।

পাপিনীগণকে মরিতে দাও। আমরা চিরকালের প্রাণের জ্বালা জুড়াইব। মা, আমাদের যে আর সহ্য হয় না। মা, আমরা মরিয়া বাঁচিব।

পৌর্ণমাসী বলিলেন, প্রেমোন্মাদিনী গোপ-রমণীগণ, অধীরা হইও না। তোমরা তোমাদের তত্ত্ব জান না। কৃষ্ণপ্রেম-বিরহ তোমাদিগকে সব ভুলাইয়াছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই তোমরা কৃষ্ণকে পাইবে। তোমরা তাঁহার, তিনি নিত্যই তোমাদের। আমি আবার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবেনা, তোমরা নিশ্চয়রূপে ইহা অবগত হও।

হঠাৎ আকাশে দৈববাণী হইল, গোপীগণ দেহত্যাগ করিও না। পৌর্ণমাসী মিথ্যা বলেন নাই, নিশ্চয়ই তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে পাইবে।

পৌর্ণমাসীর সঙ্গে বনদেবী-বৃন্দা-নান্দিমুখী ও মধুমঙ্গল আসিয়াছিলেন। বৃন্দা ও গোপীগণকে ডাকিয়া বলিলেন, গোপীগণ তীরে প্রত্যাগমন কর। আমি তোমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়তা করিব। পৌর্ণমাসীর বাক্য মিথ্যা হইবে না, তোমরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণ পাইবে।

গোপীগণ একে অপরের বদনের দিকে চাহিতে লাগিলেন। সূত্রধৃত দারুপুত্তলিকার মত অবশ ভাবে তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পৌর্ণমাসীর শ্রীচরণে সকলে প্রণত হইলেন। বৃন্দাদেবী এবং নান্দীমুখী গোপীগণকে প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

পৌর্ণমাসী বলিলেন, গোপীগণ অবিলম্বে তোমরা গৃহে গমন কর। রজনী প্রায় প্রভাতা। আমি তোমাদের মনোবাসনা যাহাতে পূর্ণ হয়, সেই ব্যবস্থার জন্ত নন্দীশ্বরে যাইতেছি। পৌর্ণমাসী গোপীগণকে মধুর-বদনে প্রবোধ দান করিয়া মধুমঙ্গলকে লইয়া নন্দীশ্বরে গমন করিলেন।

পৌর্ণমাসীর বাক্যে গোপীগণ আশ্বস্তা হইলেন। পৌর্ণমাসী পরম বিশ্বস্তা সকলেই তাঁহাকে গভীর বিশ্বাস করেন।

সেই দিন গোপীগণ পরস্পরের মধ্যে সখীত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিবেন স্থির হইল।

ললিতা বিশাখা প্রভৃতি গোপীগণ শ্রীমতীর সখী হইলেন। শৈব্যা, পদ্মা প্রভৃতি চন্দ্রাবলীর সখীত্ব অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী যূথেশ্বরী। শ্যামলা প্রভৃতি আরও কতিপয় গোপী যূথেশ্বরী হইলেও শ্রীরাধার প্রতি প্রীত্যাধিক্যে যূথেশ্বরীত্ব অঙ্গীকার করিলেন না, শ্রীরাধার অনুগতা হইলেন।

গোপীগণ যমুনা-তীর হইতে নিজ নিজ ভবনে উপনীত হইলেন। এদিকে পৌর্ণমাসী মধুমঙ্গলকে লইয়া নন্দীশ্বরে গমন করিলেন। নন্দীশ্বর-গিরি-গুহায় শ্রীকৃষ্ণ একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। আকুল প্রাণে শুধুই কাঁদিতেছেন। নীল-কমল হইতে জল বিনির্গত হইয়া সমগ্র পর্ব্বতখানা ভাসিয়া যাইতেছে। সেই জলে কত আগ্নেয়গিরি নির্ব্বাপিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কিন্তু কেবল ধূধূ ধূধূ করিয়া অবিরত শুধুই জ্বলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে একখানা হলুদে বর্ণ বস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ সেই বস্ত্রখানা দিয়া নয়ন মার্জ্জনা করিতেছেন। নয়নের মলিনতা দূর করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

চতুর্দ্দিকে পশু পক্ষী ডাকিতেছে। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা পবন দ্বারা সঞ্চালিত হওয়ায় সর্ সর্ ধ্বনি হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের কোন দিকেই লক্ষ্য নাই। তিনি কেবল আপন মনে কাঁদিতেছেন। তাঁহার দুঃখের ভাগী জগতে কেহ নাই। তাঁহার দুঃখে মাত্র তিনিই ব্যথিত। জগতের দুঃখে যিনি ক্রন্দন করেন, তাঁহার দুঃখে কেহই কাঁদে না।

পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ ভাগ হইতে মৃদু মধুর স্বরে ডাকিলেন,—"কৃষ্ণ" অকস্মাৎ প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ হইল। সমগ্র বনভূমিতে কেবল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ"!

শ্রীকৃষ্ণ চমকিত হইলেন। পশ্চাৎভাগে মুখ ফিরাইলেন। শিহরিয়া উঠিলেন। কে মা তুমি, পৌর্ণমাসী? এই গভীর রজনীতে তুমি এখানে কেন মা? অভাগার দুঃখের সমভাগী ত জগতে কেহই নাই। তুমি কেন আমার দুঃখের ভাগ লইতে আসিয়াছ মা? আমি আপন দুঃখে আপনি দুঃখিত। অপরকে এই নিদারুণ দুঃখের ভার দিয়া ব্যথিত করিবার বাসনা আমার নাই। মা, তুমি এখানে কেন? বুঝিলাম, সন্তানের জন্য তোমার কোমল প্রাণ কাঁদিয়াছে।

পৌর্ণমাসী বলিলেন, "কাঁদিও না কৃষ্ণ! আমি তোমার চক্ষুতে জল দেখিতে পারি না। স্থির হও, বৎস! তুমি যদি চঞ্চল হও, তবে উপায় কি? তোমাকে কে প্রবোধ দিতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ, পৌর্ণমাসীর চরণযুগল ধারণ করিয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন। পাষাণময়-পর্ব্বত তখন গলিয়া গেল। পশুগণ জলের উপর ভাসিতে লাগিল।

পৌর্ণমাসী বলিলেন, কৃষ্ণ অধীর হইও না। গোপীগণ প্রাণরমণ তুমি ব্যতীত কখনও অন্য কাহাকেও জানেন না। তুমি তাঁহাদের প্রাণের দেবতা। নিশ্চয়ই তুমি তাঁহাদিগকে পাইবে। চাতকীগণ যেমন নবঘনের বারি-বর্ষণ ব্যতীত কখনই অন্য জল পান করে না, তৃষ্ণায় মরিয়া গেলেও সাগর-ভরা জলের নিকট যায় না, গোপীগণও তেমনই চাতকিনীর মত নবঘন তোমার রূপামৃত পান করিবার জন্য চির আকুলিতা, সর্ব্বদাই তৃষিতা। তুমি ব্যতীত ত্রিজগতে তাঁহাদের অন্য কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গোপীগণের মনের ভাব আমি বিশেষরূপেই জানি। কিন্তু তাঁহাদের পিতা মাতা ত প্রতিকূল। তাঁহারা অন্যত্র আপন কন্যাগণের বিবাহের স্থির করিয়াছেন। গোপীগণের ইচ্ছায় ত কিছুই হইবে না, মা।

পৌর্ণমাসী বলিলেন, ভাবিও না কৃষ্ণ, আমি সেই বিবাহে বিঘ্ন উৎপাদন করিব। অন্য গোপের সঙ্গে বিবাহ হইতে কিছুতেই দিব না। তুমি স্থির হইয়া গৃহে যাও। আমি যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছি। এই মধুমঙ্গলকে তোমার নিকট রাখিয়া গেলাম। সর্ব্বদাই সে ছায়ার মত তোমার সঙ্গে থাকিবে। তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে। আজ হইতে মধুমঙ্গল তোমার সখা হইল।

পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণকে প্রবোধ দিয়া গৃহে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই দিন হইতে মধুমঙ্গলকে প্রিয় নর্মসখা-রূপে পাইলেন। রাত্রি প্রায় প্রভাত দর্শন করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। অদ্য গোপীগণের বিবাহ। পিতামাতার আনন্দের সীমা নাই। সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন আজ আনন্দ উৎসবে মুখরিত। সকলেই আনন্দিত। একমাত্র কুমারী গোপিকাগণ গৃহের কোণে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহাদের দুঃখ অন্য কেহ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। অতল-স্পর্শী সমুদ্রের মত তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব সুগভীর।

গোপীগণ ভাবিতে লাগিলেন—হায় কি হইল? দেবী পৌর্ণমাসীও কি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করিলেন? দেবতারাও মিথ্যা বলিলেন? হায় সবই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। গোপীগণ দারুণ দুঃখবেগ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আপনাপন গৃহে মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূপতিতা হইলেন। স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন অন্য গোপের সঙ্গে তাঁহাদের যেন বিবাহ হইতেছে। অমঙ্গলের চিন্তা বল করিয়া তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিল। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার ইচ্ছায় গোপীগণ জ্ঞানহারা অবস্থায়ও এই প্রকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। সেই অলীক স্বপ্নকে সত্য বলিয়া সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিলেন। মুহুর্মুহু তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল।

বিবাহের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সপ্ত প্রদক্ষিণ হইবে। যোগমায়া গোপীগণের সদৃশ মায়া-গোপী মূর্ত্তি-সৃজন করিলেন। শ্রীরাধাদি গোপীগণকে গোপন করিয়া রাখিলেন। গোপ-গোপীগণ কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। সেই মায়া-গোপী-মূর্ত্তির সঙ্গে গোপগণের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর মায়া-মূর্ত্তিগণই বাসর-গৃহে গমন করিলেন। এই মায়ামূর্ত্তিগণের প্রতিও সত্ত্ব শক্তির প্রভাবে গোপগণ কুদৃষ্টি করিলেন না। তাঁহাদের শুদ্ধ মন মায়া-গোপীমূর্ত্তি দর্শনে অধিকতর বিশুদ্ধ হইল।

বাসর-গৃহ হইতে মায়া-গোপীগণ যখন গৃহে আসিলেন, যোগমায়া তখন তাঁহাদিগকে অন্তর্হিত করিলেন। প্রকৃত গোপীগণকে প্রকাশ করিয়া দিলেন। শ্রীরাধাদি গোপীগণের তখন নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। পরদিন প্রকৃত গোপীগণই পত্যাভিমানী গোপগণের গৃহে গমন করিলেন। আপনাদিগকে তাঁহাদের পরিণীতা ভার্য্যা বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। গোপীগণ দুঃখের সহিত কল্পিত পতিগৃহে বাস করিতে বাধ্য হইলেন।

বলা বাহুল্য পতিম্মন্য গোপগণের সঙ্গে ব্রজ-গোপীগণের কখনই সঙ্গম হয় নাই,

"ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।

গোপীগণের পরকীয়া ভাবটী বুঝিবার জন্য একটী প্রাচীন আখ্যায়িকার এই স্থানে অবতারণা করা হইতেছে।

কোন রাজা দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর প্ররোচনায় প্রথমপক্ষের স্ত্রীর গর্ভ

সহৃত-পুত্রকে গভীর অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিলেন। পুত্রের বয়স তখন মাত্র আট বৎসর। গভীর অরণ্যে অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া রাজপুত্র আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। একজন সদাগর অরণ্যের নিকটবর্ত্তী নদী দিয়া নৌকা-যোগে যাইতেছিলেন। তিনি দ্বাদশবৎসর যাবৎ সপরিবারে নৌকায় অবস্থান করিতেছেন। ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্রকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া নৌকায় আসিলেন। সদাগর-পত্নী রাজপুত্রকে দেখিয়া একান্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন। রাজপুত্রকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সদাগর আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রাজপুত্রকে আপন পুত্র বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন।

সেই দেশের রাজার সঙ্গে সদাগরের একান্ত প্রীতি ছিল। সদাগর সর্ব্বদাই রাজগৃহে যাতায়াত করিতেন। তাহার পালিত পুত্রও সর্ব্বদাই সদাগরের সঙ্গে রাজগৃহে যাইতেন।

রাজার পরমা সুন্দরী এক যুবতী কন্যা ছিল, সেই রাজকন্যার সঙ্গে সদাগরের পালিত পুত্রের গুপ্ত প্রণয় হইল। তাঁহারা একান্ত সঙ্গোপনে রাজ-অন্তঃপুরে বিহার করিতে লাগিলেন। পাছে তাঁহাদের প্রেম-কাহিনী প্রকাশিত হয়, এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদাই একান্ত শঙ্কিত থাকিতেন। উপপতি ও উপপত্নীর ভাবে তাঁহাদের মধ্যে সম্বন্ধ হইতে লাগিল।

কু-কথা গোপন থাকে না। এই পাপ-কাহিনী ক্রমে রাজ্যময় প্রকাশিত হইল। মহারাজার কর্ণেও এই কথা প্রবেশ করিল। মহারাজা রাগান্ধ হইয়া রাজপুত্রকে শূলে চড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজপুত্র আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। মৃত্যু অনিবার্য্য মনে করিয়া একান্ত কাতর প্রাণে শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-কমলের শরণাপন্ন হইলেন। রাজপুত্রের করুণ ক্রন্দনে শ্রীভগবানের করুণা হইল, তিনি যোগি-পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া রাজ-সভায় উপনীত হইলেন। যোগী পুরুষ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, অপরাধীর মত ইহাকে শূলে চড়াইবেন না। এই যুবক অন্য কেহ নহে। আপনার কন্যারই স্বামী। যুবক সদাগরের প্রকৃত পুত্র নহে—পালিত পুত্র বটে।

মহারাজ বিস্মিত হইলেন। সদাগরকে প্রকৃত কথা বলিবার জন্ম আজ্ঞা করিলেন। সদাগর তখন অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত রাজ-সদনে নিবেদন করিলেন।

যোগী বলিলেন, এই যুবক অবন্তীনগরের রাজপুত্র। অষ্টমবর্ষ বয়সে ইঁহার কাছে তোমার পঞ্চম বর্ষীয়া এই কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিলে। বিবাহের অল্পদিন পরেই অবন্তীরাজ দ্বিতীয়া-স্ত্রীর সন্তোষার্থ প্রথম পক্ষের এই কুমারকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই সদাগর রাজপুত্রকে পাইয়া পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন। স্বপুত্র বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিয়াছেন।

আপনি অবন্তীরাজকে আনয়ন করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হউন।

মহারাজ অতি সত্বর অবন্তীরাজকে আনয়ন করিলেন। আলোচনায় প্রকৃত কাহিনী প্রকাশিত হইল—রাজকন্যা প্রকৃতই যুবকের পত্নী। পতির নির্ব্বাসনের পর তিনি পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছেন। বালিকা-বয়সেই পতিহারা হওয়ায় তিনি পতিকে চিনিতে পারেন নাই। পতিও পত্নীকে চিনেন নাই। তাঁহারা উপপতি ও উপপত্নী না হইয়াও যেমন আপনাদিগকে উপপতি ও উপপত্নী বলিয়া মনে করিতেন, শ্রীরাধাদি গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঠিক্ তেমনই উপপতি ও উপপত্নীভাব দৃষ্ট হইত। তবে প্রভেদ এই, রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধাদি গোপীগণের বিবাহ হয় নাই। প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের উপপতি ভাব নিত্যই আছে। তত্ত্বতঃ ব্রজসুন্দরীগণ বিবাহিতা পত্নী না হইলেও নিত্যকান্তা বটে। ব্রহ্মসংহিতায় এই তত্ত্বটী স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে,

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধাদি গোপীগণের এই উপপতি এবং উপপত্নী ভাবটী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যোগমায়ার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই কামনাটী জাগিয়াছিল,

"মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥"

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লীলাশক্তির প্রভাবে এখানে মুগ্ধবৎ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মুগ্ধতা মাত্র অনুকরণ নহে, ইহা পরম সত্য। শ্রীকৃষ্ণে

একাধারে যুগপৎ-সর্ব্বজ্ঞতা এবং মুগ্ধতার খেলা ব্রজলীলার সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই এইটী দেখা যায়, নারায়ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারে এই অপূর্ব্ব ভাবটী দেখা যায় না। নারায়ণে কেবল সর্ব্বজ্ঞতার এবং শ্রীরামচন্দ্রাদিতে কেবল মুগ্ধতার ক্রীড়া। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অভিনব-লীলা-মাধুরীর আস্বাদনের জন্য ব্রজধামে আপন ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়াছেন। গোপীগণও তাঁহার যে নিত্যকান্ত। তাহা জানিতেন না।

"আমিও না জানিমু তাহা না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥"

এখানে একটী সন্দেহ হইতে পারে, যোগমায়ার অধীনতায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সংঘটিত হইয়াছে। যোগমায়ার তত্ত্বটী না বুঝিলে এইরূপ ভাবনা অস্বাভাবিক নহে। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণেরই চিচ্ছক্তি। শ্রীকৃষ্ণ নিজ চিচ্ছক্তির শক্তিই ব্রজলীলায় প্রকাশিত করিয়াছেন—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের প্রাণধন,
প্রকট কৈলা নিত্য-লীলা হৈতে॥

আরও একটী সন্দেহ জন্মিতে পারে, অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বাসনা জাগিয়াছে। অপ্রকট লীলার পর যখন প্রকট লীলা, তখন প্রকট লীলাটী অনাদি-সিদ্ধ নহে। অপ্রকট লীলাটীই অনাদি। প্রকট লীলার পর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট লীলায় প্রবেশ। প্রকট লীলার এখানেই পরিসমাপ্তি। এইরূপ মনে করা দারুণ অপরাধ।

অপ্রকট লীলা যেমন অনাদি-সিদ্ধ, প্রকট লীলাও তেমনই অনাদি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে যুগপৎ প্রকট ও অপ্রকট লীলা করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য।

অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের অভিনব লীলা-রস-মাধুরী আস্বাদনের ইচ্ছা হওয়ায় যেমন প্রকট ব্রজলীলার কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তেমনই প্রকট লীলার পর অপ্রকট লীলার কথাও তদ্বৎ-শাস্ত্রেই দেখা যায়।

দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ব্রজবাসিগণ স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা জানিতে পারেন। শ্রীরাধাদি গোপীগণের সঙ্গে অভিমন্যু প্রভৃতির বিবাহ মায়িক, ইহাও তাঁহারা অবগত হন। ভগবতী পৌর্ণমাসী সর্ব্বসমক্ষে প্রকৃত-রহস্য পরিব্যক্ত করেন। ইহার কিছুদিন পরই লীলা অপ্রকট হন। এই সমস্ত লীলার শেষ নাই, কেবল আবির্ভাব এবং তিরোভাব মাত্র,

"এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥"

ব্রজলীলার পর শ্রীনবদ্বীপ লীলা হইলেও শ্রীনবদ্বীপ লীলাটীও যেমন অনাদি-সিদ্ধ, তেমনই অপ্রকট লীলার পর প্রকট ব্রজলীলাও অনাদি-সিদ্ধ, তাহা না হইলে লীলার নিত্যত্ব থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা জ্যোতিশ্চক্রের মত নিত্য। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই প্রকট-লীলা হইয়া থাকে। অপ্রকট-লীলাও এইরূপই কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ।

অপ্রকট লীলা হইতে প্রকট লীলার মাধুর্য্যাধিক্য। ভৌম বৃন্দাবনে লীলা-মাধুরীর অপূর্ব্ব চমৎকারিতা। এখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের গোপবেশ, গোপ-অভিমান। এই ভাবটী বড়ই মধুর,

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকৈশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রকট লীলার মধুরতা নিজে আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু অবিচারে এই মধুর-ভাবটী সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন,

"আপনি করি আস্বাদনে শিখাইলা ভক্তগণে
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈলা দান
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি॥

মধুর ভক্তিরসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার জন্যই এতগুলি কথার অবতারণা করা হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের লীলা-মাধুরীতে প্রবেশ বহু ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব হইলে তৎপর রাগানুগা-ভক্তের কৃপাপ্রভাবে এই মধুর ভক্তি রসে আসক্তি জন্মে। রাগানুগা ভক্তিতে তখনই চিত্ত আবেশিত হয়, রাগাত্মিকা-ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই রাগানুগা-ভক্তি বলে,

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগতা ভক্তির রাগানুগা নাম॥

অভীষ্ট ব্রজরাজ-নন্দনে যে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা, তাহার নাম রাগ। এই রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজবাসিগণেই নিত্য বিরাজিত। ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-প্রাপ্তি-লোভে ব্রজবাসিগণের অনুগত হইয়া যাঁহারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের তাদৃশ অনুষ্ঠানকেই রাগানুগা বলা হয়। সাধকরূপে (যথাবস্থিত দেহে) এবং সিদ্ধরূপে (অন্তশ্চিন্তিত গুর্ব্বাজ্ঞাত মঞ্জরী-দেহে) ব্রজগোপীর ভাব-লাভের অভিলাষে তাঁহাদের অনুসরণ পূর্ব্বক সেবা করিতে হইবে। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামিপাদকে বলিয়াছেন,

"বাহ্যান্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য দেহেতে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

রাগানুগা-ভক্তিতে স্মরণেরই মুখ্যত্ব। এই স্মরণ আবার নিজ ভাবোচিত লীলা, বেশ ও ভাব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের এবং তদীয় প্রিয়জনের পরিচিন্তনময়। কীর্ত্তনাদিও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। অর্চ্চনাদিতে মুদ্রান্যাসাদি, দ্বারকাধ্যানাদি ও রুক্মিণ্যাদি-পূজন আগমাদি-শাস্ত্র বিহিত হইলেও নিজভাবের বিরোধী বলিয়া অবশ্য পরিত্যাজ্য। ভক্তিমার্গে কিঞ্চিৎ অঙ্গ-হানি হইলেও ক্ষতি নাই। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন "হে উদ্ধব, আমাতে ভক্তিরূপ এই ধর্ম্মের উপক্রমে অঙ্গবৈগুণ্যাদি ঘটিলেও কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ হয়না।"

বস্তুতঃ ভক্তি অধিকারীর বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপের অননুষ্ঠানে বা তত্ত্যাগের হানিতে কোন দোষ হয়না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"কর্ম্মত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণি

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সঙ্গে ভক্তির কোনই সম্বন্ধ নাই, বরং চরিতামৃতে দেখিতে পাই—

"এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণের শরণ॥

ব্রজলীলা পরিকরস্থ শৃঙ্গারাদি ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণে যখন নিজের ঐ রূপ ভাব-লাভের অভিলাষ হয়, তখন শাস্ত্র-যুক্তিতে অপেক্ষা থাকেনা,

লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

"নাহি মানে" শব্দে শাস্ত্রকে মান্য করেন না, এইরূপ অর্থ নহে। শাস্ত্রের অপেক্ষা থাকেনা, ইহাই তাৎপর্য্য। রাগানুগা-ভক্ত, কেবল ব্রজের ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তত্তদ্ভাব লাভের অভিলাষী হন। শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাব শ্রীভাগবত হইতেই অবগত হওয়া যায়, রাগমার্গের সাধকগণের শ্রীমদ্ভাগবতই প্রধান শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভজন মধুর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। **ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কথা।** নিম্ন শ্লোকটিতে আরাধ্যতত্ত্ব, ব্রজোপাসনার মধুরত্ব প্রভৃতি মধুর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

মহাপ্রভু ব্রজবধূগণের ভজনের অনুসরণ করিবার জন্যই জগৎকে শিক্ষাদান করিয়াছেন্। গৌর-অবতারের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত। তাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজের মধুর ভজনটি জগতে প্রচার করিয়া-

ছেন। বাসুদেব ঘোষ গৌরলীলার মাধুরীটি নিম্নোক্ত পদটীতে প্রকাশিত করিয়াছেন,

"যদি গৌর না হত কেমন হইত
কেমনে ধরিতু দে।
রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা
জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী রসের আরতি
শকতি হইত কার॥
গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ তিন ভুবনে এমন দয়াল
না দেখি আর কোন জন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে সেধেছে সিঁধি
বাসুঘোষ হিয়া পাষাণে মিশিয়া
গড়েছে বা কোন্ বিধি?

কবি প্রেম দাস গাহিয়াছেন—

এ মন, এমন গৌরাঙ্গ বিনে।
প্রেম বলি নাম অতি অদভুত
শ্রুত হৈল কার কানে॥
শ্রীকৃষ্ণ-নামের সগুণ মহিমা
কেবা জনাইত আর।
বৃন্দা বিপিনের মহা মধুরিমা
প্রত বা হইত কার?
কেবা জানাইত রাধার মহিমা
রস যশ চমৎকার?

তার অনুভব সাত্ত্বিক বিকার
গোচর হইত্য কার ?
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস
প্রেম পরকীয়া তত্ত্ব।
গোপীর বাভার ব্যভিচারী সার
কার গতি ছিল এত ?
ধন্য কলি ধন্য নিতাই চৈতন্য
কলি জীবে কৃপা করি।
বিধি অগোচর যে প্রেম-ভাণ্ডার
বিলাইল জগ ভরি ॥
উত্তম অধম কিছু না বাছিল
যাচিয়ে দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দে এমন গৌরাঙ্গে
হৃদয়ে ধরিয়ে দোল ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্মের উপদেশ সমূহ বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছে।

হায়! কি বিষম দুঃখের কথা, আজকাল কেহ কেহ মহাপ্রভুর এই উদ্দেশ্যটী বিফল করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইয়াছেন। তাঁহারা ব্রজোপাসনা বাদ দিয়া নবা গৌর-ভজন প্রচার করিয়া আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের উপর বিষম আঘাত প্রদান করিতেছেন। উপধর্ম্মের ভীষণ আক্রমণেও এই ব্রজোপাসনা উঠাইবার কেহ চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু এই শ্রেণীর ভক্তগণ ব্রজোপাসনার বিরুদ্ধে দারুণ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। ইঁহারা একনিষ্ঠ গৌর-ভক্ত-নামে পরিচিত। তাঁহাদের মতে শ্রীগৌরাঙ্গই উপাস্য। শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌর দুই তত্ত্ব। কলিযুগে গৌরই ভজনীয়।

সাধারণ লোক ইঁহাদের আপাত মধুরকথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। কিন্তু হায়! ইহা কি গৌরভজন ?

যে গৌরভজনের ফল কৃষ্ণ-বিস্মৃতি, তাহা প্রকৃত গৌরভজন নহে। ইহা মনগড়া গৌরভজনের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। জাহ্নবীর তীরে কূপ খনন করিয়া বারি পানের চেষ্টা বস্তুতঃই প্রবল দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক

শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত, ভাবনিধি মহাপ্রভু-আস্বাদিত, ব্রজের উন্নত উজ্জ্বল মধুর রসটী তদানুগত্যে আস্বাদনই, প্রকৃত গৌর ভজন। যিনি ব্রজ-গোপীর মধুর রস-আস্বাদক, তিনিই প্রকৃত গৌরভক্ত-মুকুটমণি। ব্রজের মধুর রসই নিখিল রসের সার। ভাগ্যবান্ সুধন্য গৌরভক্তগণের ইহাই একমাত্র জীবাতু।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পরকীয়া-ভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতেছেন। ইঁহারা মহাপ্রভুর মতটী সর্ব্বাংশে দলিত করিয়া নব্য মত প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত গৌর-ভক্ত তাঁহাদিগকে গৌরবিদ্বেষী নামে আখ্যাত করিয়া অপরাধী হইতেছেন। শাস্ত্রানভিজ্ঞতা এবং সৎসঙ্গতির অভাবেই এইরূপ ঘটিয়াছে। দৈন্যের স্থানে আত্মম্ভরিতা ইঁহাদের ভূষণ হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপের যোগপীঠের জ্ঞানটীও ইঁহাদের আছে, বোধ হয় না। থাকিলে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাদি চারিতত্ত্বকে বাদ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের চেষ্টা করিতেন না।

মহাপ্রভু শাস্ত্র বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন প্রচার করিয়াছেন। ইঁহারা শাস্ত্র বাদ দিয়া স্বকল্পিত মতে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। ভক্তির উপর এই নিদারুণ আঘাত একান্তই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

ইঁহাদের ব্যবহারে একান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের পরম শাস্ত্রজ্ঞ এবং ভজনবিজ্ঞ পণ্ডিত বাবাজী (শ্রীল মনোহর দাস) শ্রীবৃন্দাবনবাসী-বিরক্ত বৈষ্ণব বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণপদদাস বাবাজী প্রভৃতি ভূপাগ্রে বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে নব্য-গৌরবাদের প্রতিবাদ-সভায় পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পত্র "সোনার-গৌরাঙ্গ" পত্রিকার ২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাশিম-বাজারাধিপতি-গৌড়রাজর্ষি মহারাজা স্তার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, বাহাদুর, ময়মনসিংহ সেরপুরের ব্রজরস রসিক পরম ভাগবত জমীদার রায় শ্রীল রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর-প্রমুখ পরম গম্ভীর বৈষ্ণবরন্দও ইঁহাদের ব্যবহারে বিচলিত হইয়া "মাধুকরী" পত্রিকার পৌষ-মাঘ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই সব বিষয় মীমাংসার জন্য রায় বাহাদুর মহাশয় সুবিখ্যাত "পল্লীবাসী" পত্রিকায় একটী মহতী সভা আহ্বানের প্রস্তাবও করিয়াছেন। এই প্রস্তাবটী পরম-সমীচীন ও সময়োপযোগী সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় নব্য গৌরবাদীগণের বিচারে আগ্রহ নাই, গালাগালিতে তাঁহারা

আপনাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। ইহাতেই সিদ্ধান্তের আলোচনায় অসামর্থ্য প্রকাশ পায়।

ভক্তি অর্থই গোস্বামি-শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী নিম্নোক্ত দুইটী শ্লোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

"সা ভক্তিঃ সপ্তম স্কন্ধে ভঙ্গ্যা দেবর্ষিণোদিতা॥

সপ্তম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের ত্রিংশ শ্লোকে দেবর্ষি নারদ ভঙ্গীক্রমে সাধন-ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন—

"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"

নারদ ঋষি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, রাজন! যে কোন উপায়েই হউক শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা বিধেয়।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্,

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ, অপূর্ব্ব লীলা-মাধুরী দ্বারা ত্রিজগত আকর্ষণকারী, পরম-প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি আনুকূল্যবিশিষ্ট অনুশীলনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত চেষ্টা বা অভিলাষ, যদি রুচিকর হয়, তবেই তাহাকে ভক্তি বলে। যদি ঐ অনুশীলনে অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদির সংযোগ না থাকে; তবে তাহাকে উত্তমা-ভক্তি বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি বাদ দিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভক্তি-সাধন, বিড়ম্বনা নহে কি? রামায়ত সম্প্রদায়ও কীর্ত্তনের শেষে গাহিয়া থাকেন,

"সীতা রাম জয় সীতা রাম, রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম॥"

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীরাধাশ্যাম মধুর নামটী বাদ দিয়া ভক্তি-সাধন করেন, ভাবিতেও যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ইহার নামই কি গৌর-ভক্তি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভক্তিরস পাঁচ প্রকার। শান্তরসে নরাকৃতি পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ালম্বন। সনকাদি তপস্বিগণ আশ্রয়ালম্বন। শান্তি ইহার স্থায়ী ভাব।

দাস্য ভক্তি রসে, ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসলাদি গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। আশ্রয়ালম্বন চতুর্ব্বিধ অধিকৃত ভক্ত, আশ্রিতভক্ত পারিষদভক্ত অনুগামী ভক্ত। ব্রহ্মাও শঙ্করাদি অধিকৃত ভক্ত। কালীয়নাগ, মগধাধিপতি

জরাসন্ধ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ রাজগণ আশ্রিতভক্ত। উদ্ধব, দারুক ও শ্রুতদেবাদি পারিষদ ভক্ত। পুরে সুচন্দ্রও মণ্ডনাদি এবং ব্রজে রক্তক-পত্রক ও মধুকণ্ঠাদি অনুগামী ভক্ত। উক্ত ভক্তগণ আবার নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধও সাধকভেদে ত্রিবিধ। দাস্যরসের তিনটী অবস্থা; প্রেম, রাগ ও স্নেহ। অধিকৃত ভক্তে ও আশ্রিত ভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী। পার্ষদ ভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী। পরীক্ষিত দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয়। ব্রজানুগ রক্তকাদিতে এবং পুরে প্রদ্যুম্নাদিতে সকল গুণই দেখা যায়।

অনন্তর সখ্য ভক্তি-রস। এই রসে বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, সুবেশ এবং সুখী ইত্যাদি গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। আশ্রয়ালম্বন চতুর্ব্বিধ; সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে অধিক, যাঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ বাৎসল্য আছে, তাঁহারাই সুহৃৎ, ব্রজে সুভদ্রমণ্ডলী ভদ্রও বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃদ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন, যাঁহাদের ভাব দাস্য-মিশ্র, তাঁহারাই সখা, ব্রজে বিশাল, বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতি। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের সমান, তাঁহারাই প্রিয়সখা, ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম প্রভৃতি। যাঁহারা প্রেয়সীর সঙ্গে রহস্য-ক্রীড়ার সহায়, শৃঙ্গার-ভাব স্পৃহাযুক্ত, তাঁহারাই প্রিয়নর্ম্ম সখা, ব্রজে সুবল, মধুমঙ্গল ও অর্জ্জুন প্রভৃতি। সখ্যরসে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব। হর্ষ ও গর্ব্বাদি সঞ্চারীভাব। সাম্যদৃষ্টি হেতু সম্ভ্রমহীন বিশ্বাস বিশেষই স্থায়ীভাব। প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ সখ্যরসে দেখা যায়। পুরে অর্জ্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদাম বিপ্রাদি সখা।

বাৎসল্য রসে, কোমলাঙ্গ বিনয়ী ও সর্ব্বলক্ষণান্বিত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণ আমার অনুগ্রহ-পাত্র এইরূপ ভাববিশিষ্ট পিত্রাদি আশ্রয়ালম্বন। ব্রজে, ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিণী উপানন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি অন্যত্র দেবকী, কুন্তি ও বসুদেব প্রভৃতিই আশ্রয়ালম্বন। এই রসে বাৎসল্যরতি স্থায়ীভাব। উক্ত বাৎসল্যরতির প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মধুর রসে রূপমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্য-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্ব্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারী ভাব। প্রিয়তা রতি স্থায়ীভাব। এইরসে প্রেম-স্নেহ-রাগাদি উজ্জ্বল নীলমণি বর্ণিত সমস্ত অবস্থাই দৃষ্ট হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া এই মধুর রসটী আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীরাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মহাপ্রভুর মর্ম্মভেদী বিলাপ একান্ত আস্বাদনের বস্তু। বিরহ-লীলাটী মহাপ্রভু অনন্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,

"নবঘন স্নিগ্ধ বর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ
ইন্দিবর নিন্দি সুকোমল।
যিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন
কৃষ্ণ কান্তি পরম প্রবল॥
সখি! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
খানিক যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥
এই ব্রজের রমণী কামার্কতপ্ত কুমুদিনী
নিজ করামৃত দিয়ে দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাই সখি রাখ মোর প্রাণ॥"
"প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া তার গুণ সোঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন ছাড়িলেক বেদ-ধর্ম্ম
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥
কৃষ্ণ-লীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি,
আশা ঝুলি কান্ধের উপর॥
কৃষ্ণ গুণ রূপ রস গন্ধ শব্দ পরশ
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন॥

শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণ ধ্যানে
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥
মনঃ কৃষ্ণ বিয়োগী দুঃখে মনঃ হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মনঃ গেল পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয়॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥
এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি দিনে।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি কহে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরা-মন্দিরে শয়ন করিতেন, কিন্তু তাঁহার ঘুম হইত না। কৃষ্ণ-বিরহে অস্থির হইয়া ভিত্তে মুখ ও শির ঘর্ষণ করিতেন। দরদর ধারে রক্ত নির্গত হইত,

"গম্ভীরা ভিতরে প্রভুর নাহি নিদ্রা লব।
ভিত্ত্যে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥

মহাপ্রভু নিজে কাঁদিয়া জগৎকে কাঁদাইয়াছেন। এই কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদাকে ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিযোগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,

"ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই কৃষ্ণ বলি স্মরণ ক্রন্দন॥
কৃষ্ণ বলি কাঁদিলে সে কৃষ্ণনাথে মিলে।
ধনে জনে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥"

শ্রীপাদ রামানুজ, নিম্বার্ক. মধ্বাচার্য্য ও বিষ্ণুস্বামী বেদান্তের ভাষ্য রচনা দ্বারা ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন।

রামানুজের শ্রীভাষ্য। ইহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে।

নিম্বার্ক চতুঃসন, মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মাভাষ্য, বিষ্ণুস্বামী রুদ্রভাষ্য রচনা করেন। এই চারিজন মহানুভব বৈষ্ণবাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্য রচনা করিয়া চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গঠন করেন। এই চারিটী সম্প্রদায়ের কথা পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন,

"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।

সনক-সম্প্রদায়ের অন্য নাম নিম্বার্ক-সম্প্রদায়।

শ্রীমধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। ইনি বেদান্তের দ্বৈতবাদ-ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যই ব্রহ্মভাষ্য নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মভাষ্যে জ্ঞানিগুরু শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ (অদ্বৈতমত) খণ্ডন করিয়া শত প্রকারে গুরুতর দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভাষ্যের এই জন্যই অপর নাম শতদূষণী। মাধ্ব-সম্প্রদায়কে তত্ত্ববাদীও বলা হয়।

রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক স্বামী ইহাঁরা সকলেই শঙ্করাচার্য্যের দশনামী-সম্প্রদায়-সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যে দোষ দর্শন করিয়া শঙ্কর-মত-খণ্ডনে বেদান্ত-দর্শনের স্বতন্ত্র ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইহাঁরা সকলেই ভক্তিবাদী।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা আবির্ভাব। রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বেদান্ত-অবলম্বনে যে ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা ভক্তিই প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তি-সাধনের শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ ব্রজের সর্ব্বোচ্চ প্রেমভক্তি কাহারও দ্বারা প্রচারিত হয় নাই। জাম্বুনদ-হেমতুল্য অকৈতব যুগলকিশোরের প্রেম-মাহাত্ম্য কেহ প্রকাশিত করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুই অবতীর্ণ হইয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ হইতে ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি যে ভক্তিবীজ বপন করিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবে সেই ভক্তি নূতন আকারে জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

মহাপ্রভুর অভিনব ভক্তিবাদে জগতে নূতন উন্মাদনা জাগাইয়া দিল। ভক্তির অপূর্ব্ব সরসতায় সকলে স্নিগ্ধ হইলেন। মহাপ্রভু জগতে উন্নত-উজ্জ্বল মধুর-রসের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী আনন্দে অধীর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম মধুর-তত্ত্ব জগতে জানাইলেন,

"অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদান্তের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদ স্থাপন করিলেন। জীব ঈশ্বর হইতে চিদংশে অভিন্ন, আবার অন্যাংশে ভিন্ন। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার কিঙ্কর, মহাপ্রভু শাস্ত্র-বাক্যদ্বারা জগতকে বুঝাইলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন,

"মায়াধীশ মায়াবশ জীব ঈশ্বরে ভেদ।
হেন জীব ব্রহ্মে তুমি কহত অভেদ?

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে আরও-বলিলেন, গীতা-শাস্ত্র ও জীবশক্তি নামে ঈশ্বরের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। তুমি শাঙ্কর-ভাষ্য দ্বারা কি প্রকারে তাহা অস্বীকার করিতেছ,

"গীতা শাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে॥

গীতার শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

বস্তুতঃই জীব মায়ার দাস, নিত্য দুঃখী, শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বানন্দময়,

"হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দঃ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকর॥

জীব ও ভগবানে একত্ব প্রকাশ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,

"কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥

মীমাংসকগণ ঈশ্বরকে কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। সাংখ্য প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন। ন্যায়-দর্শন পরমাণুকে বিশ্বের কারণ বলিয়া প্রচার করেন। মায়াবাদীগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া

থাকেন। ই'হারা কেহই পরম কারণ কৃষ্ণকে মান্য করেন না। সকলই মাত্র পর-মত খণ্ডন করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করেন,

"পরম কারণ ঈশ্বর কেহ না'হি মানে।

স্ব স্ব মত স্থাপে পর-মতের খণ্ডনে॥

কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়, কর্ম্ম, প্রকৃতি ও পরমাণু এই তিনটীর কোনটীই জগতের পরম কারণ নহে। ঐ তিনটীই জড়বস্তু। তাহাদের ঈক্ষণ-কর্ত্তৃত্ব নাই। শ্রুতি বলেন, কর্ত্তার ঈক্ষণে জগৎ সৃষ্টি এবং আনন্দ ইহার মূল।

'ঈক্ষতে" এই সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য-ধৃত শ্রুতি—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য-ধৃত শ্রুতি—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি॥"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উদ্ধৃত শ্রুতি-বাক্যে তাঁহার প্রচারিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না। শঙ্করের কল্পিত ব্রহ্ম নিরবয়ব, সুতরাং তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিশেষ ঈক্ষণত্ব নাই। মনোবৃত্তি সংকল্প-পূর্ব্বকই সৃষ্টি হয়, কিন্তু নিরবয়ব ব্রহ্মের মন না থাকায় সংকল্প পূর্ব্বক সৃষ্টি হইতে পারেনা। অতএব শঙ্করের কল্পিত ব্রহ্ম কিছুতেই জগত-কারণ হইতে পারেন না। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণই জগতের কারণ,

"ব্রহ্ম শব্দে বলে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥

নিম্ন শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণের পর ব্রহ্মত্ব সূচিত হইয়াছে,

"অহো ভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনং।

ঈক্ষণাদি-সর্ব্বশক্তিমান আনন্দময় বস্তুই জগতের পরম কারণ। এই সমস্ত গুণ শ্রীকৃষ্ণেই দৃষ্ট হয়, ব্রহ্ম-সংহিতা বলেন,

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।

অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণং॥

অচেতন দণ্ডাদি যেমন ঘট-নির্ম্মাণের কারণ নহে। কুম্ভকারই কারণ সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্ট্যাদির মূল কারণ, "অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ-কারণ,"

ব্রহ্মসূত্রের "কামাচ্চ" সূত্রের-ভাষ্যে রামানুজ ইহা করিয়াছেন,

"জীবস্য বিদ্যাপরবশস্য" জীব মায়ার একান্ত বশীকৃত "অন্তঃ" সূত্রের শ্রীভাষ্যে বর্ণনা,

"পরমাত্মনঃ—কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরহিতত্বমিত্যর্থঃ।
কর্ম্মাধীন সুখদুঃখভাগিত্বেন কর্ম্মবশ্যাঃ জীবাঃ॥

"কর্ম্ম কর্ত্তৃ" ইহার শ্রীভাষ্য—

"প্রাপ্তা জীব উপাসকঃ প্রাপ্যং ব্রহ্মোপাস্যং।" প্রাপ্তা ইতি তৃন্ প্রত্যয়ান্তঃ। প্রাপ্ত হয় বলিয়া জীব ব্রহ্মের উপাসক। প্রাপ্য হন বলিয়া ব্রহ্ম জীবের উপাস্য।

ঈশ্বর উপাস্য ও জীব উপাসক, জীব ঈশ্বরে এই ভেদ স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"ভেদব্যপদেশাচ্চ" ইহার রামানুজ ভাষ্য—

তস্মাৎ্—জীবাদপি তস্যভেদং ব্যপদিশতি।"

জীব হইতে ব্রহ্মের অবশ্য ভেদ রহিয়াছে। পরমেশ্বর হইতে জীবের বৈলক্ষণ্য—পরমেশ্বর সেব্য, জীব সেবক। পরমেশ্বর বিভু, জীব অণু।

শাস্ত্র বলেন, "স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীব যস্তয়ার্দ্দিতঃ" মায়া যাঁহার বশীভূত তিনি ঈশ্বর। নিরন্তর যিনি মায়া-দ্বারা ক্লিষ্ট, তিনি জীব। জীব অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ, এই জন্য মায়া তাহাকে দুঃখ দেন,

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

"অপি চ স্মর্য্যতে" শাঙ্কর ভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে,

"ঈশ্বর গীতাস্বপি চেশ্বরাংশত্বং জীবস্য স্মর্য্যতে।"
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি।

তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ। রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও গীতার "মমৈবাংশ" শ্লোক উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং জীব পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অংশ, তাহা সমস্ত ভাষ্যকারের মতেই

সিদ্ধান্তিত হইতেছে। জীব ঈশ্বরে ভেদ এখানে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইল।

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন:—

আচার্য্য শঙ্কর স্বকৃত ভাষ্যে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। শঙ্করের দোষ নাই, শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায়ই শঙ্কর ভক্তি-বিরোধী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে ৬২ অঃ শিবং প্রতি কৃষ্ণবাক্য,

আচার্য্যের দোষ নাই ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥
"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈ স্তঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

হে মহাদেব, তুমি কল্পিত-অর্থ-প্রকাশে লোকসকলকে মদ্বিষয়ে ভক্তি বিমুখ কর। এই ভাবে তুমি আমাকে গোপন কর। সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক।

শঙ্কর নিজেই পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন, "হে দুর্গে! কলিযুগে আমি (শিব) ব্রাহ্মণরূপে (শঙ্করাচার্য্যরূপে) অসৎ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি—যে শাস্ত্রকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলে,

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

মহাপ্রভু অদ্বৈত মতটী সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন করিয়া ভক্তিসৌধের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ব্যাস-সূত্র সূর্য্য-কিরণের মত স্বপ্রকাশ, শ্রীপাদ শঙ্কর ভাষ্যরূপ মেঘদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়াছেন,

"ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥

বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র বৃহদ্বস্তু বলিয়া ব্রহ্মকে—নিরূপণ করিয়াছেন। আকাশাদি জড় বস্তুও বৃহৎ, এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম "ঈশ্বর" অর্থাৎ তিনি নিয়ন্তা, তিনি চেতন, আকাশাদির মত জড় বস্তু নহে। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি সবিশেষ অর্থাৎ সাকার। তিনি রাসাদি নানাবিধ

বিনোদ-লীলা-বিলাসী, তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া গালি দেওয়া বড়ই অন্যায়,

'বিলাস বিনোদ লীলা বই নাই যাঁর।
নির্গুণ বলিয়া গালি দেই কোন ছার?

ব্যাস-সূত্রের শ্রীভাষ্যে "অথাতঃ" এই প্রথম সূত্র ভাষ্য—

"ব্রহ্ম শব্দেন চ স্বভাবতো নিরস্ত-নিখিল-দোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয় কল্যাণগুণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। সর্ব্বত্র বৃহত্ব গুণযোগেন হি ব্রহ্ম শব্দঃ বৃহত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। স চ সর্ব্বেশ্বর এব অতো ব্রহ্মশব্দ স্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ।"

ব্রহ্ম-শব্দে অভিধাবৃত্তিতে অশেষ-কল্যাণ-গুণবিশিষ্ট পুরুষোত্তমকে বলে। বৃহত্ব গুণ যোগেই ব্রহ্মশব্দ। তিনি বৃহৎ এবং সর্ব্বেশ্বর, সুতরাং সেই ঈশ্বরই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ।

"চিন্মাত্র বপুষি পরে ব্রহ্মণি।"

পরব্রহ্মের দেহ চৈতন্যমাত্র। অর্থাৎ চৈতন্যময়। তত্রৈব, "সবিশেষং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সাকার।

'শুদ্ধে মহৎবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দতে।
মৈত্রেয়! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণে॥
এবমেব মহাশব্দো মৈত্রেয়। ভগবানিতি।
পরম ব্রহ্ম ভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ॥

হে মৈত্রেয়, সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মেই ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ হয়। ভগবান্ এই শব্দটী পরব্রহ্ম বাসুদেবেরই—অন্যের নহে।

উক্ত "অথাতঃ" সূত্রের মাধ্বভাষ্য—

'ব্রহ্মশব্দশ্চ বিষ্ণুরেব" ব্রহ্ম-শব্দে বিষ্ণুকেই বুঝায়। সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বৃহৎ বস্তু ব্রহ্মকে নিরাকার বলা নিতান্ত অসঙ্গত,

"বেদে পুরাণে করে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥

"একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দ ঘন ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যাবলম্বনে শঙ্কর বলেন, একমাত্র নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই বস্তু। বিদ্যাকর্তৃক উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, এবং অবিদ্যা কর্তৃক উপহিত চৈতন্য জীব। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটিলে জীব বা ঈশ্বর-ভাব থাকে না, তখন কেবল নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র অবাঙ্মতি ব্রহ্মই থাকেন।"

মায়াবাদের উপরোক্ত কল্পনা, বড়ই আশ্চর্য্যজনক। একভাগের বিদ্যাশ্রয় ও অন্যভাগের অবিদ্যা-পরাভূতি কিরূপে ঘটিতে পারে? চিন্মাত্র ব্রহ্ম এমন কি অপরাধ করিলেন, যে, তাঁহাকে বিবিধ ক্লেশের অনুভব-ভাজন হইতে হইল? আকস্মিক এই অজ্ঞানই বা কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই। একথাটি গোবিন্দভাষ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন,

'যুগপদেবাকস্মাদেবাজ্ঞানযোগাদেকস্য ভাগস্য বিদ্যাশ্রয়ত্বমন্যস্যাবিদ্যা-পরাভূতির্বিতি কিমপরাদ্ধং তেন ব্রহ্মণা যেন বিবিধ বিক্ষেপক্লেশানুভবভাজনতাভূৎ। পুনরপ্যাকস্মিকাজ্ঞানসম্বন্ধস্যাশক্যত্বাবক্তর্ম্মিতি ন তদুক্তরীত্যা তাবত্তাগো বাচ্যঃ।"

অদ্বিতীয় শব্দে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ পরিশূন্য। এতাদৃশ ব্রহ্মের জগত-কার্য্য কি প্রকারে হইতে পারে? যদি মায়ার অঙ্গীকার এরূপ বলা হয়, তবে ব্রহ্ম ব্যতীত "মায়া" বস্তুকেও স্বীকার করিতে হইবে। মায়াকে স্বীকার করিলে আর অদ্বিতীয়ত্ব থাকে না। অন্য একটী প্রশ্নও করা যাইতে পারে, তৎকালে সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞান মাত্র ব্রহ্ম মায়ার বিদ্যমানতা জানিতেন বলা হয়, তবে নির্গুণ ব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানশালিত্ব ধর্ম্ম আপতিত হয়, ব্রহ্মের নির্গুণত্ব আর থাকে না।

কেহ মনে করিতে পারেন, শ্রুতিতে সবিশেষ ব্রহ্মের কথা থাকিলেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সবিশেষ ব্রহ্ম দুই-ই স্বীকার করিয়াছেন। তদুত্তরে বক্তব্য—বেদের ঐ সগুণ ও নির্গুণ উভয় বাক্যই সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক। এক ব্রহ্মে দ্বিবিধ বিরুদ্ধভাব স্বীকার করা যায় না।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যজ্ঞানময়ং তপঃ য আত্মাপহত পাপ্মা বিজরো

বিমৃত্যুঃ" যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলই জ্ঞাত, যাঁহার কার্য্যাদি জ্ঞানময়, যিনি জরা মৃত্যু-রহিত। ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য সগুণ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যিনি গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি-পাদক।

এখানে সগুণ শব্দে স্বাভাবিক গুণ-বিশিষ্ট। নির্গুণ শব্দে প্রাকৃত গুণ রহিত। যে শ্রুতির আশ্রয়ে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়, সেই শ্রুতিতেই "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি ব্রহ্মের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। এখানে স্পষ্টরূপেই ব্রহ্মের সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্মের কথা ব্যক্ত আছে। সুতরাং ব্রহ্মের ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার্য্য। ধর্ম্ম স্বীকার সগুণত্ব অস্বীকার করা যায় না। পুরুষসূক্ত মন্ত্রাদিতে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত দিব্য দেহ, ইহা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে,

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাদিত্যাদিনা' তস্যাপ্রভূতদিব্যরূপ-শ্রবণাৎ"

আমি এই মহান্ পরমাত্মাকে আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় অন্ধকার-বিনা-শক অপ্রাকৃত দিব্যদেহধারী বলিয়া জানি।

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন,

"নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন॥"

যে সমস্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরাকার বলেন, সেই শ্রুতিই আবার রূপ-গুণ-বিশিষ্ট সাকার বলেন। বিচার করিয়া দেখিলে নিরাকার প্রতিপাদক-শ্রুতি অপেক্ষা সাকার-পর শ্রুতিই বলবতী, সাকার-পর শ্রুতিতেই নিরাকার-পর শ্রুতির পর্য্যবসান,

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

শ্রীভগবান্ যখন অনেকরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন তিনি জীবের প্রারব্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"

শ্রীভগবানের যখন এই ইচ্ছা হইল, তখন প্রাকৃত নয়ন ও মনের জন্ম হয় নাই, কেননা মনন ও ঈক্ষণের পর প্রাকৃত সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাকৃত-জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের মন ও নয়ন থাকায় তাঁহার মন-নয়নাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত,

"ভগবান বহুত হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥
সেই কালে না জন্ময়ে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥"

ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ, স্বয়ং-ভগবান। শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। বেদের নিগূঢ় অর্থ গ্রহণ বড়ই কঠিন। পুরাণ-বাক্যেই বেদের অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে,

ব্রহ্ম শব্দে বলে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করিয়ে নিশ্চয়॥

শাস্ত্র স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

"যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং"॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই পরস্পর বিরুদ্ধ-বাক্যের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছেন।

"অপাণিপাদঃ" ব্রহ্মের হস্ত ও পদ নাই। এই শ্রুতি-বাক্যে প্রাকৃত হস্ত পদের কথাই বলা হইয়াছে। "জবনো গৃহীতা" এই পরবর্ত্তী বাক্যে ব্রহ্ম চলেন এবং গ্রহণ করেন বলা হইয়াছে। পদ না থাকিলে চলা এবং হস্তের অভাবে গ্রহণ অসম্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম অপ্রাকৃত হস্ত-পদ-বিশিষ্ট, অতি স্পষ্ট-রূপেই বুঝা যাইতেছে,

"অপাণিপাদ শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ॥

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি লক্ষণাতে মান নির্ব্বিশেষ॥

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে তিরস্কার বাক্যে বলিতেছেন,

"ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার?"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্যের অদ্বয়-জ্ঞান. (মায়াবাদ) শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা সর্ব্বাংশেই খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন না করিলে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই বিষয়টী সকলেরই বিশেষভাবে অনুধাবন একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—মায়াবাদ কুসিদ্ধান্তময়—ইহা বর্ণনা করিয়া জীবের প্রকৃত স্বরূপ বলিতেছেন,

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ-দাস,
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।"

জীব-কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি হইলেও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, শ্রুতিও বলিতেছেন, "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।"

উপরোক্ত পয়ারে ইহাও সিদ্ধান্তিত হইল, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে; শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা জীব-শক্তির অংশ।

দাসের অবশ্যই প্রভুর সেবা কর্ত্তব্য। স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইয়া তদ্ভজন না করা বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। জীব যে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভজন না করার মত মহাপাপ আর কি হইতে পারে? কৃতঘ্নতা আর কাহাকে বলে? যাহা হইতে জন্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" তাঁহাকে ভজন না করিলে পিতৃদ্রোহী পাতকী বলিতে হয়,

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

এই সমস্ত অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের কথা। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভক্তি। বিধি-ভক্তির প্রাপ্যস্থান বৈকুণ্ঠধাম, একমাত্র রাগভক্তির ফলে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ হয়,

"রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠকে যায়॥"

কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগাদি খণ্ডন করিয়া মহাপ্রভু ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার রাগানুগা-ভজনই মহাপ্রভুর বিশেষ লক্ষ্য।

অনেকে মনে করেন, এই রাগানুগা ভজনটী একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছেন—অন্য শাস্ত্রে ইহার বর্ণনা নাই। এ কথা একান্ত ভুল। গীতাদি শাস্ত্রেও রাগভক্তির কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছেন,

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,

"এতাদৃশা অনন্যভক্তা
সাধন-দশায়ামপি ভাগ্যবশাৎ ভজনে নির্ব্বিঘ্নে সংপদ্যমানে
সতি তুষ্যন্তি তদৈব ভাবি স্বীয় সাধ্যদশামনুস্মৃত্য রমন্তি চ
মনসা স্বপ্রভুনা সহ রমন্তি চেতি রাগানুগাভক্তির্দ্যোতিতা।"

সাধন-দশায় ভাগ্যবশে নির্ব্বিঘ্নে ভজনসম্পাদনে ভক্তগণ সন্তোষ লাভ করেন। ভাবী স্বীয় সিদ্ধদেহ স্মরণ করিয়া মনে মনে আপন প্রভুর সহিত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। রাগানুগা-ভক্তি বিবৃত হইল।

গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকটীতেও প্রীতি-ভক্তির কথা এবং ভক্তিযোগে ভগবৎ-প্রাপ্তির সুলভতা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥"

যিনি অনন্যচিত্তে আমাকে নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সমাহিত-চিত্ত (ভক্তি)-যোগীর পক্ষে আমি সহজ-প্রাপ্য।

পূর্ব্বে জরা-মরণ-মোক্ষ-কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির কথা এবং ভগবৎভাব-প্রাপক যোগ-মিশ্রা-ভক্তির কথা বলিয়া একণে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নিগুর্ণা কেবলা-ভক্তির বিষয় বলিতেছেন। যিনি কর্ম্ম-যোগাদি সাধন এবং স্বর্গ ও মোক্ষাদি-সাধ্য পরিত্যাগ করিয়া আমাকে পাইবার অভিলাষে দেশ-কালাদির বিশুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া প্রতিদিন আমাকে স্মরণ করেন, সেই ভক্তেরই আমি মুখ্য লভ্য। যোগ-জ্ঞানাভ্যাসাদি-সাধনে দুঃখের মিশ্রণ রহিয়াছে, কিন্তু ভক্তি-সাধনে তাহা নাই। "যোগিনঃ" শব্দের অর্থ—

ভক্তি-যোগ-সম্পন্ন অথবা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি সম্বন্ধ বিশিষ্ট ভক্ত। প্রীতিমান তাদৃশ ভক্তের বিরহ আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি তাহার সাধনের প্রতিকূল-অবস্থা বিদূরিত করিয়া সাধন দশার পরিপাকে তাহাকে দর্শন দান করি। আমি স্বয়ংই বলিয়াছি, "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" শ্রুতিও বলিয়াছেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।" যাঁহাকে তিনি বরণ করেন, তিনিই প্রাপ্ত হন। তাহাকেই আত্মা নিজ তনু বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবগণ এই জন্যই কীর্ত্তনের শেষে ভাগবত ও গীতার নাম-গান করেন; "হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।"

গীতায় যে রাগভক্তি মুকুলিত, ভাগবত-গ্রন্থে তাহাই বিকশিত। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি গোস্বামি-গ্রন্থে নানা শাস্ত্র-বচন দ্বারা তাহাই ফল-পুষ্পে সুশোভিত। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত প্রভৃতি লীলা-গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিস্তারিত হইয়াছে।

রাগানুগা-ভজনের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। মধুর-রসাশ্রিত ভক্তই ইহার আশ্রয়। ব্রজগোপীর অনুগতি ব্যতীত কিছুতেই এই ভক্তির অধিকারী হওয়া যায় না।

জীব মাত্রই সুখের জন্য লালায়িত। সুখের জন্য জীব-জগতের ছুটাছুটি। সুখের আকর্ষণে কেহ সাগর সিঞ্চন করিতেছেন। কেহ বা আকাশে উড্ডীন হইতেছেন। কেহ বা বিশ্ব-বিজয়ের জন্য নাচিতেছেন। কেহ বা পর্ব্বত লঙ্ঘনের নিমিত্ত আকুল হইয়াছেন। কেহ বা দুর্ব্বলকে নিপীড়ন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কই, সুখ মিলিতেছে কি, সুখী হইতেছেন কি?

বস্ত্রে যদি জল থাকে, তবে তাহা হইতে জল পাওয়া যায়। প্রাকৃত-জগতে যদি প্রকৃত-সুখ থাকিত, তবে চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইত। কিন্তু সুখ-বস্তু যে এই মর-জগতরে নহে। সুখ এই প্রাকৃত জগতে নাই। সুখ মায়াগন্ধহীন, সুখ চিন্ময়, সুতরাং মায়িক-জগতে তাহা থাকিতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্ম-বস্তুই সুখ-স্বরূপ, অন্যত্র এই সুখ নাই। শ্রুতি বলিতেছেন, 'আনন্দং ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম আনন্দময়। ঘনীভূত আনন্দ নিত্যই ব্রহ্মে আছেন। এখানে ব্রহ্ম অর্থ, নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ নহে,—পূর্ব্বে বলা

হইয়াছে, ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃত অর্থ সাকার, সগুণ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই আনন্দের একমাত্র অধিকারী, "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন"। কমললোচন, শ্রীনন্দ-নন্দনই আনন্দের একমাত্র স্বামী,

"আনন্দৈক সুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

আনন্দ-ঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত কিছুতেই সুখলাভের আশা করা যাইতে পারে না। তিনি পরম রসময় "রসো বৈ সঃ"। রসিকা শিরোমণি, রসময় শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহিনী, আনন্দরসের-খনি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর চরণ আশ্রয় সুখলাভের প্রধান উপায়। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।"

শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ, গৌর-অনুগত ভক্তগণের প্রার্থনীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সঙ্গে থাকেন, তখনই তিনি মদন মোহন—নতুবা নিজেই মদন-মোহিত। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্যবস্তু যুগল-কিশোর শ্রীরাধা-কৃষ্ণ।

রাগানুগা-ভজন এই শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই করিতে হয়। এই ভজনেই জীবনের কৃতার্থতা—পূর্ণরূপে সফলতা।

সাধক-দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলা ভাবনা করা যায়, যুগল-কিশোরের যে প্রকার সেবা করা হয়, সিদ্ধ-দেহে তাহাই পাওয়া যায়।

"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা।"

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তদুর্লভ অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য কেবল এই রাগানুগা-ভক্তিতে আস্বাদিত হইয়া থাকে। সর্ব্বোত্তম প্রেম (মধুর প্রেম) ব্যতীত কখনই শ্রীকৃষ্ণের মধুর-মাধুরী আস্বাদন করা যায়না।

ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিকী প্রীতি, তাহাকেই রাগ বলে। এই রাগময়ী ভক্তিকে শাস্ত্র রাগাত্মিকা বলেন,

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"

আর ব্রজবাসি-জনে স্পষ্টরূপে বিরাজিত যে রাগাত্মিকা ভক্তি, সেই ভক্তির অনুগামিনী ভক্তিকে রাগানুগা বলে।

রাগানুগা-ভক্তির পরিপাটী—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ প্রিয়গণের মধ্যে নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রিয়-জনের ভাবানুগত হইয়া মনোমধ্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবা করিতে হয়,

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥"

নিজাভীষ্ট অর্থাৎ যিনি বাৎসল্য-ভাবে ভজন করিতে চাহেন, তাঁহাকে নন্দ-যশোদার ভাবের অনুগত হইতে হইবে। যিনি মধুর-ভাবে ভজন করিতে চাহেন, তিনি মধুর-রসাশ্রিতা গোপীগণের আনুগত্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

বিদগ্ধ-রসিক-নবীন-যুবক দেখিলে যুবতী যেমন বিমোহিতা হন, শ্রীকৃষ্ণের অপার রূপ-গুণের মোহন-মাধুরীর আকর্ষণে তেমনই ভক্ত কেন, পশুপক্ষী প্রভৃতিও আকৃষ্ট হইয়া থাকেন,

"পশু পক্ষী বৃক্ষ মৃগ চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥"

যাঁহার রূপে গুণে পশু-পক্ষীও বিমোহিত হয়, তাঁহার রূপে আকৃষ্ট না হওয়া মনুষ্যেরই পরম দুর্ভাগ্য। রূপে গুণে বিমোহিত হইয়া যে তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি, তাহাকেই অনুরাগ বলে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেবা-লাভের জন্য গুর্ব্বাজ্ঞাত মঞ্জরী-দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাই রাগানুগা-ভক্তি। সাধক এবং সিদ্ধ এই উভয় দেহেই সেবা-কার্য্য করিতে হয়,

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজ-লোকানুসারতঃ॥"

বৈধী-ভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্তি-অঙ্গের (চতুঃষষ্টি অঙ্গের) কথা শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন, রাগানুগা-ভক্তিতেও সেই ভক্তি অঙ্গগুলি অবশ্যই অনুষ্ঠেয়,

"শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥"

বিধি ও রাগ উভয়মার্গের সাধনায় একই প্রকার, কেবল উভয়ে ভাবের স্বাতন্ত্র্য। দাসী ছেলেকে লালনপালন করে, মাতাও করেন। দাসীর সেবা-কার্য্য বাধ্য হইয়া—প্রেমে নহে, কিন্তু মাতা স্বাভাবিক স্নেহেই পুত্রকে প্রতি-পালন করেন।

বৈধী-ভাবে সাধক শ্রীএকাদশী-ব্রত পাপের ভয়ে করেন, রাগমার্গের সাধক এই ব্রত শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয় বলিয়া প্রীতির সহিত করিয়া থাকেন।

সিদ্ধদেহের অর্থ—চিন্ময়দেহ, অপ্রাকৃত দেহ। জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত (জড় ও চিন্ময়) দুইটী দেহই আছে। প্রাকৃত দেহের ক্ষয়ে অপ্রাকৃত দেহের বৃদ্ধি, অপ্রাকৃত দেহের বৃদ্ধিতে প্রাকৃত দেহের ক্ষয় হইয়া থাকে। সাধক যতই ভজনে অগ্রসর হন, তাঁহার দেহ ততই চিন্ময় হইয়া থাকে। পূর্ণতম ভজনে জড়ীয় দেহই পূর্ণভাবে চিন্ময় হইয়া যায়। রাসলীলার নিম্নোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় চক্রবর্ত্তিপাদ এই বিষয় অতি সুন্দররূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

"তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥

কেহ কেহ বলেন, "ত্যক্ত-দেহ" গুণময় অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মকই হইয়া থাকে। এখানে "গুণময়-দেহ" দেহের বিশেষণ। তাহা না হইলে "গুণময়" ইহা না বলিলেও হইত ; কারণ, দেহ বলিলেই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহকেই বুঝায়। "গুণময় দেহ" বলাতেই অগুণময় (চিন্ময়) অন্য একটী দেহও সূচিত হইতেছে।

যেমন চিনি বলিলেই হয়, মিষ্ট চিনি বলায় কোন অর্থ নাই। তেমনই "গুণময়" দেহ বলিবার কোনই তাৎপর্য্য ছিল না—যদি অন্য "চিন্ময়" দেহ এই শব্দের অভিপ্রেত না হইত। এইখানে অন্য একটী চিন্ময়-দেহের ধ্বনি স্পষ্ট-রূপেই পাওয়া যাইতেছে। শ্লোকোক্ত

"গুণময়" শব্দের অর্থ—গোপীগণের দেহ বেণুবাদনের পূর্ব্বেই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এক গুণময়, অপর চিন্ময়। গুণময় যে দেহ পতি-কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই স্থলে বিবেচ্য—গুরূপদিষ্ট ভক্তির আরম্ভ-দশাতেই শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, দণ্ডবৎ, প্রণতি ও পরিচর্য্যাদিময়ী শুদ্ধা ভক্তি, অন্তরে উদিত হইলে "নির্গুণা

মদপাশ্রয়" অর্থাৎ "আমার শরণাগত ব্যক্তি নির্গুণ" এই উক্তিতে ভক্তগণ স্বীয় শ্রবণাদি দ্বারা শ্রীভগবৎ-গুণাদি গ্রহণ করিয়া নির্গুণ হন, কিন্তু ব্যবহারিক শব্দাদি গ্রহণে গুণময়ত্ব তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে ভক্ত-দেহ, আংশিক নির্গুণ ও আংশিক সগুণ হইয়া থাকে। "ভক্তি পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" "তুষ্টি-পুষ্টি-ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং" এই ন্যায়ে ভক্তি-বৃদ্ধির তারতম্যে নির্গুণ দেহাংশের আধিক্য ও ন্যূনতার তারতম্য ঘটে। গুণময় দেহের ক্ষীণত্ব তারতম্যে সম্পূর্ণ প্রেম উৎপন্ন হইলে গুণময় দেহাংশ সর্ব্বাংশে নষ্ট হইয়া সম্যক্‌-রূপে নির্গুণ হইয়া যায়। গুণময় দেহের ক্ষয়ে দেহ চিন্ময় হয়।

শ্রীভগবান্ যেমন মৌষল-লীলাতে যাদবগণের দেহপাত দেখাইয়াছেন, তেমনই এখানেও মায়া দ্বারা বহির্ম্মুখগণের মত-নিরাকরণ ও ভক্তিযোগের রহস্য রক্ষার নিমিত্ত গোপীগণেরও স্থূল-দেহের বিনাশ দেখাইলেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা বহির্ম্মুখগণের বঞ্চনার নিমিত্ত যোগমায়ার কার্য্য। কোথায়ও বা স্থূল-দেহের পতন দৃষ্ট হয় না, যেমন ধ্রুবাদির দেহ। ধ্রুব-মহাশয় দেহ পরিত্যাগ না করিয়া সে দেহেই ধ্রুবলোকে গিয়াছিলেন। তাঁহার জড়ীয়-দেহই চিন্ময় হইয়াছিল। স্পর্শমণি-স্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, ভক্তির স্পর্শে জড়ীয়-দেহও তেমনই চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গোপীগণ দেহ-ত্যাগ না করিয়াই ধ্রুবাদির মত সেই দেহেই কৃতার্থা হইয়াছিলেন। এখানে সাধন-সিদ্ধা গোপীগণের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাদের দেহই গুণময় এবং নির্গুণ দুই অংশে বিভক্ত ছিল। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের দেহ চির চিন্ময়, তাহাতে জড়ত্বের লেশ মাত্রও থাকিতে পারেনা।

ভক্তদেহের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভু ঠাকুর-হরিদাসকে বলিয়াছেন,

> "প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
> অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
> দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্ম-সমর্পণ।
> সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্ম-সম
> সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
> অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয়॥

সনাতন গোস্বামীকেও বলিয়াছেন,

"তোমার দেহ তুমি কর বিভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃত-সমান
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়॥

প্রকৃতিচরীও ঋষিচরী গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথমই শুদ্ধ—চিন্ময়,তাঁহারা যোগমায়া কর্ত্তৃক পুরুষান্তর দ্বারা অস্পৃষ্টা হইয়া ব্রজে বাস করিতেছিলেন। পরে নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গ-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমতী হইয়াছিলেন।

যাঁহারা গুণময়-দেহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পতিগণ কর্ত্তৃক তাঁহারাই অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন। রাস-রজনীতে মধুর বংশী শ্রবণ করিয়া যখন প্রেম-পাগলিনী হইয়া ছুটিয়াছিলেন, তখনই পতিগণ তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। পতি কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রবল বিরহ জাগিয়া উঠিল। সেই বিরহরূপ প্রখর তাপে তাঁহাদের গুণময় দেহ চিন্ময় হইয়াছিল। তাঁহারা গুণময় দেহত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরহ-জ্বালা কোটি বাড়বানলের প্রবল দাহন ও নবক্ষ্বেলকূটের তীব্র জ্বালা হইতেও গুরুতর হইয়াছিল। এই সমস্ত ঋষিচরী গোপী সেই রাস-রজনীতেই নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের পশ্চাতে শ্রীরাস-মণ্ডলে গিয়াছিলেন।

"প্রক্ষীণ বন্ধনা" শব্দের অর্থ অবিদ্যাবন্ধন ও পতিগণ-কর্ত্তৃক নিবারণ এতদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যোগমায়ার আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মৃত্যুবশে তাঁহাদের দেহপাত কিছুতেই হইতে পারে না। পরম মঙ্গলময় রাসোৎসব আরম্ভে মৃত্যুরূপ অমঙ্গল কিছুতেই সংঘটিত হইতে পারে না। উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই পরে বলিয়াছেন, "যে সমস্ত গোপী প্রথম রাসোৎসবে যাইতে পারেন নাই, সেই সমস্ত কল্যাণী আমার বিরহরূপ তীব্র তাপে অমঙ্গল-হীন হইয়া পরে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

সর্পের কঞ্চুক ত্যাগ যেমন দেহত্যাগ নয়, গোপীর প্রাকৃত দেহত্যাগও তেমনই দেহত্যাগ হইতে পারেনা। এই শক্তি-উপভুক্তা সাধনসিদ্ধা গোপীগণের প্রতিও কৃপা প্রদর্শনে শ্রীভগবানের অশেষ ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

[illegible]

ধ্বংসের করণ তাহার অবতারের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার ভ্রূভঙ্গী মাত্রই কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইতে পারে।

"ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ"-শব্দের অর্থ—গোপীগণ ধ্যান করিতে নিরত হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-প্রকাশেই স্বয়ং তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া গোপীগণকে প্রেম-মধুর আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

যিনি ভক্তের প্রতি কৃপা-প্রদর্শনার্থ উত্তরার রক্ত, মাংস, মূত্র ও পুরীষময় উদরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি পরম প্রেমবতী গোপীগণকে প্রবল বিরহ-সন্তাপ নিবারণের জন্য আলিঙ্গন করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে—পরন্তু একান্ত স্বাভাবিক। ইহা না করিলে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইত।

সিদ্ধদেহের চিন্ময়ত্ব বিষয়ে প্রসঙ্গাধীন আরও একটু আলোচনা করিতেছি। ঠাকুর হরিদাস দেহত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভু বিমানে চড়াইয়া শ্রীহরিদাসের দেহ কীর্ত্তন করিয়া সমুদ্রে লইয়া গেলেন। হরিদাসকে পুণ্যতীর্থ-শিরোমণি সমুদ্র-জলে স্নান করাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, সমুদ্র আজ হইতে মহাতীর্থ হইলেন,

"হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইল॥

যে দেহ স্পর্শ করিলে অপবিত্র হইতে হয়, সেই দেহের স্পর্শ পাইয়া তীর্থ আজ মহাতীর্থ হইলেন। ইহাতেই সাধারণ-দেহ হইতে ভক্ত-দেহের বিশেষত্ব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে।

ভক্তগণ শ্রীহরিদাসের শ্রীচরণের জল পান করিতে লাগিলেন। হরিদাসের অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিলেন।

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥

ভক্ত-দেহ অপ্রাকৃত না হইলে ভক্তগণ কখনই হরিদাসের পাদোদক পান করিতেন না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি হরিদাসের দেহ চিন্ময়ই হইল, তবে সে দেহের বিনাশ ঘটিল কেন? ইহার উত্তর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইহা কেবল বহির্মুখগণকে প্রতারণা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইন্দ্রজালের মত ইহা মায়িক।

নিপুণ ঐন্দ্রজালিক একখানা ১০০০৲ টাকার নোট অগ্নি-সংযোগ করিয়া ভস্ম করে। পর-মুহূর্ত্তেই আবার সে আর একখানি পূর্ব্ব নম্বরের নোটই বাহির করিয়া দেয়। যদি প্রকৃতপক্ষে হাজার টাকার নোট পুড়িয়া সে আর একখানা নূতন নোট দিতে পারিত, তবে দৈনিক ১৲ টাকা পাইবার জন্য সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত না। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, সে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বের নোটখানা দগ্ধ করে নাই—মাত্র লোকের নিকট অদ্ভুত ধাঁধাঁ প্রকাশ করিয়াছে।

সামান্য ঐন্দ্রজালিকই যদি অসংখ্য দর্শক-মণ্ডলীকে বঞ্চিত করিতে পারে, তবে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি অভক্তের দৃষ্টিকে কেন ভ্রান্ত করিতে পারিবেন না?

রাগানুগা-ভজনের প্রধান কথা লীলা-স্মরণ। নিশান্ত হইতে নৈশ-লীলা পর্য্যন্ত আটটী লীলা তৈলধারাবৎ স্মরণ করিতে হইবে। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,

"সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা
কায়মনে করিয়া সুসার॥

কায়মনে-শব্দের অর্থ—দেহে অর্থাৎ সাধক-দেহে, মনে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-দেহে। সিদ্ধদেহ-স্ফূর্ত্তি মায়িক-জগতে সহজে হইবার নহে, তাই প্রধানভাবে প্রথম অবস্থায় সাধক-দেহেই লীলা-স্মরণ আরম্ভ করিতে হয়। সাধক-দেহে স্মরণ এবং নিত্য আপনার গোপ-কিশোরী (মঞ্জরী) স্বরূপ পরিচিন্তন দ্বারা ক্রমে মানসিক (সিদ্ধ)-দেহে লীলা-স্মরণের উপযোগিতা ঘটে।

অনেকে লীলা-স্মরণকে ব্যাঘ্রের মত ভয় করেন; কেহ কেহ লীলা-স্মরণের মুখ্যত্ব, অপূর্ব্বত্ব স্বীকার করিয়াও অধিকারী বিচারের অবতারণা করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির পূর্ব্বে লীলা-স্মরণ-সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। লীলা-স্মরণ ভক্তি-সাধন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ভক্তিতে সকলেরই সমান অধিকার। ভক্তি-সাধনে অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার নাই,

"নাত্রাস্তঃ প্রয়তে ভক্তৌ নূমাত্রস্য অধিকারিতা"।

তবে ভক্তি সাধনে মাত্র শ্রদ্ধার অপেক্ষা আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সমস্ত প্রকার সাধনের (কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি) মধ্যে ভক্তি-সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আবার

ভক্তি-সাধনের মধ্যে রাগভক্তি শ্রেষ্ঠতম। এই রাগভক্তির একমাত্র প্রচারক আমার শ্রীমন্মহাপ্রভু। রাগভক্তির প্রধান অঙ্গ লীলা--স্মরণ, সুতরাং লীলা-স্মরণটি বাদ দিলে মহাপ্রভুকেই বাদ দেওয়া হয়। মহাপ্রভুকে প্রকৃতরূপে আস্বাদন করা যায় না।

জগাই মাধাই, চাপাল গোপাল প্রভৃতি পতিত-পাবন লীলা মহাপ্রভুর অবতারকে তেমন উজ্জ্বল করেন নাই—রাগানুগা ভক্তি প্রচার তন্মধ্যে আবার মধুর-রসের প্রচার—মহাপ্রভুর কৃপা--অবতারকে যেমন উজ্জ্বলতম করিয়াছেন।

এই রাগভক্তির বার্ত্তা মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার মুখে প্রকাশ করিয়াছেন,

> "সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্ত-মেঘে
> স্বভক্তি-সিদ্ধান্ত-চয়ামৃতানি।
> গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ
> স্তজ্জত্ব রত্নালয়তাং প্রয়াতি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ সমুদ্র রামানন্দরায়-রূপ ভক্ত--মেঘে নিজ (কৃষ্ণ) বিষয়ক ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহ রূপ জল সঞ্চার করিয়া রামানন্দ মেঘ-প্রদত্ত জল দ্বারা সিদ্ধান্তবোধ-রূপ রত্নালয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভক্তেরই ভক্তি, ভক্তই ভক্তিকে প্রকাশ করিতে পারেন, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভক্তিরস-রহস্য-সিদ্ধান্ত বলিতে পরম ভক্ত শ্রীরামানন্দ রায়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া তৎপ্রকাশিত উক্ত সিদ্ধান্তকে শ্রীকৃষ্ণ-গৌর ধারণ করিলেন। বৃষ্টিজল-দ্বারাই মুক্তাদি রত্নের উদ্ভব হয়। এই জন্য সমুদ্র মেঘে নিজের জল সঞ্চার করিয়া সেই মেঘ-প্রদত্ত বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন রত্নরাশিকে ধারণ করে।

মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বলিলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-বিবর্ত্ত (শৃঙ্গাররস)ই ভজন-রাজ্যের সারকথা। কিন্তু রায়, উহা প্রাপ্তির সাধনপ্রণালী বল। সাধন ব্যতীত ত সাধ্যবস্তু পাওয়া যাইতে পারে না,

> "প্রভু কহে সাধ্য বস্তুর অবধি এই হয়।
> তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
> সাধন-বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
> কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দ রায় বলিলেন, আমি ভাল-মন্দ কিছুই বলিতে জানি না। আমার মুখে তুমিই বক্তা, আবার তুমিই শ্রোতা। তুমি আমাকে যাহা বলাইতেছ, আমি মাত্র তাহাই বলিতেছি। আমার বলা কেবল শুক পাখীর পাঠের ন্যায়,

"রায় কহে যে কহায় সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ইহা আমি কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য-শুন সাধনের কথা॥

এই রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রেরণায় সাধ্যবস্তুর মধুরতার এবং দুর্লভতার কথা বলিয়া সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির উপায় বলিতে লাগিলেন,

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে একা সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি॥
সখী-ভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

রাগানুগা-ভক্তি ব্যতীত ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার অন্য উপায় নাই,

"রাগানুগা-মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

ব্রজলোকের ভাবের আনুগত্যে ভক্তি করিলেই ভাবযোগ্য দেহ লাভে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি ঘটে,

"ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে।"

তৈলপায়িকা যেমন কাচপোকাকে ভাবিতে ভাবিতে কাচপোকার দেহ ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ভক্তগণও তেমনই সিদ্ধ মঞ্জরী-দেহ ভাবিতে ভাবিতে মঞ্জরী-দেহ প্রাপ্ত হন। যিনি যে ভাবে লুব্ধ হন, তাঁহার সেই ভাববিশিষ্ট ব্রজলোকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

উপনিষদ্ শ্রুতিগণ এবং দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ রাগানুগা-মার্গে ভক্তি করিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন,

"তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্র-নন্দন।"

লীলা-স্মরণের মধুর গুণে নিতান্ত বহির্ম্মুখও শ্রীভগবৎপরায়ণ হইয়া থাকেন। বহির্ম্মুখী মনকে অন্তর্ম্মুখী করিতে লীলা-স্মরণই প্রধান সহায়। লীলা-স্মরণ সর্ব্বসাধারণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, অকরণে দারুণ প্রত্যবায়—নিম্নোক্ত শ্লোকে এইটি পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে,

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকা লিখিয়াছেন, "ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপর তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধ্যেব কাচিদতর্ক্যা শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত্ত এব তচ্ছ্রবণাধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতং।"

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তাদৃশী মনোহরলীলা করেন, যে লীলা শ্রবণে মনুষ্য-দেহধারী অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রই শ্রীভগবৎ-বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হইবে। "মনুষ্য দেহধারী" শব্দের তাৎপর্য্য-মনুষ্যত্ব-বিহীন মনুষ্য-চর্ম্ম-ধারী মাত্রই। মধুর-রসময়ী এই লীলার মণি-মন্ত্র মহৌষধাদির ন্যায় কোন অচিন্ত্য শক্তি আছে। এই লীলা শ্রবণে ভক্তগণের মত মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার আছে।

শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন "যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্ত্যোত্যো-

ইন্দ্রোহপি জন স্তৎপরোভবেৎ"। যাহা (এই মধুর রাসলীলা) শ্রবণ করিলে ভক্তগণের ত দূরের কথা অন্যজন (অভক্তজন) ও শ্রীকৃষ্ণ-পরায়ণ হইবেন।

তৎপর-শব্দের বিবিধ অর্থ হয় বটে, কিন্তু শ্রবণ ভিন্ন অন্যার্থ সঙ্গত নহে। তৎপর অর্থ—শ্রবণ-পর।

চরিতামৃতকার এই শ্লোকের পয়ার করিয়াছেন,

"ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্ সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য অন্যথা প্রত্যবায়॥

"ভবেৎ" এই যে ক্রিয়া উহার "বিধি অর্থে "লিঙ্" হওয়ায় এই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে—"গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলা" অবশ্যই শ্রবণ কর্ত্তব্য। লীলা শ্রবণ না করিলে একাদশীব্রত অকরণে প্রত্যবায় যে প্রকার (অপরাধ) হয়, সেই প্রকার প্রত্যবায় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসের লীলা সকলের শ্রবণ উচিত নহে—একথা একান্ত ভ্রান্তি-মূলক।

মহাপ্রভুর প্রশ্নে রামানন্দের উত্তর—

"শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমগান কর্ণ রসায়ন॥"
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম॥"

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা বলিতেছেন,

"মনের স্মরণ-প্রাণ, মধুর মধুর ধাম
যুগল বিলাস স্মৃতি সার
সাধ্য সাধন এই, আর নাই ইহা বই
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি সার॥

ঠাকুর-মহাশয় আরও বলিয়াছেন,

শুন শুন ওরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করহ ভাবনা॥
এই সব রস-লীলা যে করে শ্রবণ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলা শ্রবণে, বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্তগণের কথা কি,

বিরুদ্ধবাদী নাস্তিক ও ম্লেচ্ছাদি জনও মোহিত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণে যবন ও ম্লেচ্ছাদির আগ্রহও স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীরাসলীলার সর্ব্বশেষে শ্রীশুকদেব গোস্বামিচরণ একটী শ্লোকে ভক্তি-যোগের সুগভীর মাহাত্ম্য জলদ-গম্ভীর-স্বরে বর্ণনা-দ্বারা জগতের প্রতি আশী-র্ব্বাদ করিয়াছেন।

এই শ্লোকটিতে জ্ঞান-যোগাদি হইতে ভক্তি-সাধনের উৎকর্ষ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। নিম্নে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল,

> "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
> শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
> ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
> হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

শ্রীজীব গোস্বামিপাদের টীকার সামান্য অংশ আস্বাদন করা যাইতেছে,

"অন্যত্র শ্রূয়তে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরামিতি" অত্র তু হৃদ্রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তিঃ প্রাপ্তিঃ। তস্মাৎ পরমবলবদেবেদং সাধনমিতিভাবঃ ধীরঃ সন্নিতি ধৈর্য্যঞ্চ লভত ইত্যর্থঃ। যদ্বা। কামং যথেষ্টং আশুভক্তিং প্রতিলভ্য হৃদ্রোগ-মাধিং শ্রীকৃষ্ণা-প্রাপ্ত্যাদি কৃতমচিরেণাপহিনোতি তৎ-প্রাপ্তিরিতি ভাবঃ।

চক্রবর্ত্তিপাদের বিস্তৃত টীকা হইতেও সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, "হৃদ্রোগবত্যপ্যধিকারিণি প্রথমতএব প্রেম্নঃ প্রবেশস্তত্তৎপ্রভাবেনৈবাচিরতো হৃদ্রোগনাশ ইতি প্রেমায়ং জ্ঞানযোগ ইব ন দুর্ব্বলঃ পরতন্ত্রশ্চেতি ভাবঃ। হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়কঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ তস্যঃ প্রেমামৃত-রূপত্বেনতদ্বৈপরীত্যাৎ। ধীরঃ পণ্ডিত ইতি হৃদ্রোগেসত্যপি কথং প্রেমাভবে-দিত্যনাস্তিকা লক্ষণেন মূর্খত্বেন রহিত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রদ্ধান্বিত ইতি শাস্ত্রাবিশ্বাসিনং নামপরাধিনং প্রেমাপি নাঙ্গীকরোতীতি ভাবঃ॥

জ্ঞান ও যোগাদি হইতে ভক্তি-সাধন শ্রেষ্ঠ। আবার সর্ব্বলীলা-চূড়ামণি রাসলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সর্ব্বপ্রকার ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, এই শ্লোকে তাহাই বিশদ্‌-ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন।

"হৃদয়-রোগ কাম" এই বাক্যে ভগবদ্বিষয়ক যে কাম তাহা নিবারণ করি-

তেছেন। শ্রীভগবৎ-বিষয়ক কাম, কাম নহে, তাহা প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাম ও প্রেম শব্দের অর্থ ইচ্ছা। একই অর্থ হইলেও ইচ্ছা যখন স্বসুখাভিমুখী হয়, তখন তাহাকে কাম বলে। ঐ ইচ্ছা ভগবৎ-প্রীতির নিমিত্ত হইলে প্রেম নামে অভিহিত হন। লৌহ এবং স্বর্ণ উভয়ই এক জাতীয় (ধাতব) পদার্থ হইলেও এই দুইয়ের যেমন অশেষ পার্থক্য, তেমনই কাম ও প্রেম একশ্রেণীর হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কামের ফল আত্মহত্যা। প্রেমের ফল আত্মলাভ। প্রেমের ফলে নিজ স্বরূপ-স্ফূরণে শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে,

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

শ্লোকোক্ত "বর্ণন" শব্দটী উপলক্ষণ মাত্র। এই শব্দ দ্বারা স্মরণ, অনুমোদনাদিও সূচিত হইতেছে।

শ্রীগীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥"

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মেতে অবস্থিত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি বিনষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির আশাও তাঁহার নাই। তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই শ্লোকে হৃদয় বিশুদ্ধ না হইলে ভক্তি লাভ হয় না স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। শ্লোকটীতে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে।

রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলে হৃদয়-রোগ-বিনাশের পূর্ব্বেই পরমাভক্তি লাভ হইয়া থাকে, শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী মধুর-ভাষায় ভক্তগণকে এই ভরসা দিতেছেন। জ্ঞানযোগ হইতে ভক্তিযোগের এই মাধুরীটী বড়ই মধুর। জ্ঞানযোগে আগে চিত্তশুদ্ধি, পরে ভগবৎ-প্রাপ্তি। ভক্তিযোগে চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বেই ভক্তি-লাভ। কাম-কলুষিত হৃদয়েও ভক্তি-লাভ ঘটে, এইটী অন্যান্য (জ্ঞানযোগাদি) সাধন হইতে ভক্তি-যোগের অপূর্ব্বতা। এই রাসলীলা শ্রবণরূপ সাধন, সর্ব্বসাধন হইতে বলবান্।

এই শ্লোকের আর একটী অভিপ্রায়—অচিরকালের মধ্যে ভক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-অপ্রাপ্তিরূপ হৃদ্রোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

হৃদয়-রোগী (কাম-ক্রোধাদি-পরিপূর্ণ) ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায় লীলা-স্মরণ। লীলা-শ্রবণ ভক্তি সাধনের প্রধান অঙ্গ। উহা সাধন-ভক্তি, আবার সাধ্যও বটে। ঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন, "সাধ্য-সাধন এই, আর নাই ইহা বই, এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি সার।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামিপাদের শিক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-শ্রবণাদিকে সাধনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি চিত্ত-শুদ্ধির পূর্ব্বে লীলা-স্মরণ, পাঠ ও কীর্ত্তনাদি অনুচিত হয়, তবে ত মহাপ্রভুর শিক্ষাই ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রেম-ভক্তি লাভের সমকালেই চিত্ত-শুদ্ধি হইয়া থাকে। ঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন, "যদি হয় প্রেমভক্তি, তবে হয় চিত্ত-শুদ্ধি।" প্রেমভক্তি ও চিত্তশুদ্ধি এই দুইটী "কাক-তাল" ন্যায়ের ন্যায়। তাল পক্ক হইয়া পতিত হইবার আসন্ন সময়ে কাক তালে বসিবা মাত্রই তালটী ঝরিয়া পড়ে। তালটী পাকিয়া পতিত হইবার সময় কাকটী বসিলেই যেমন তালটী পতিত হয়, তেমনই প্রেমভক্তির সমকালেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। মলিন চিত্তেও প্রেমভক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, ভক্তি চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা রাখেন না, তিনি অনন্য-নিরপেক্ষ। কখন কোন্ কারণে কাহার চিত্তে প্রকাশিত হন, ইহা বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম নিত্যসিদ্ধ। শ্রবণাদি দ্বারা চিত্ত পরিমার্জ্জিত হইলেই প্রকাশিত হন,

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারাই চিত্ত-শুদ্ধি হইয়া থাকে। যদি লীলা-স্মরণ করিতে চিত্ত-শুদ্ধির অপেক্ষা থাকে, তবে চিত্ত-শুদ্ধির জন্য অন্য একটী সাধনের প্রয়োজন হয়, ইহা নিতান্ত ভ্রম।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, ভাগবত-শাস্ত্র শ্রেষ্ঠতম ভাগবত। ভক্তও একতম ভাগবত। এই দুই ভাগবতই ভক্তি লাভের প্রধান কারণ,

"এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র॥
দুই ভাগবত সঙ্গে করে আস্বাদন।

শ্রেষ্ঠতম ভাগবতের বর্ণিত শ্রীভগবৎ-লীলা শ্রবণ ও স্মরণাদিতে যাঁহারা বঞ্চিত, তাঁহারা বড়ই দুর্ভাগ্য। ভীষণ কলিকালে প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত বড়ই দুর্লভ। চতুর্দ্দিকেই, পৈশাচিক লীলা। আজ যাঁহাকে মহা ভাগবত বলিয়া ভক্তি-পূর্ণ প্রাণে পূজা করা যায়, হয়তঃ কল্যই তাঁহার চরিত্র-দোষ দর্শন করিয়া ভক্তের প্রতি, ভক্তির প্রতি একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। এই দুঃসময়ে সর্ব্বপ্রকারে ভাগবতী কথা আস্বাদন একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদ ও ইতিহাসের সার। ব্যাসদেব আত্মজ্ঞানীদের প্রধান আপন তনয় শ্রীশুকদেব গোস্বামিচরণকে এই গ্রন্থ পাঠ করাইয়াছিলেন,

"তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥

সর্ব্ববেদান্তের সার শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃতে তৃপ্ত জনের অন্য কিছুতে কখনই রতি হয় না,

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
"তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥"

নিগম (বেদ) কল্পতরু হইতে গলিত ফল-স্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত শুক-মুখের দ্রব-অমৃত সংযুক্ত হইয়া অখণ্ডরূপে ভূমণ্ডলে পতিত হইয়াছে, অতএব হে ভাবনাচতুর রসজ্ঞগণ! এই রসময় ফল লয় (মৃত্যু) না হওয়া পর্য্যন্ত বারম্বার পান করিতে থাক,

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

পরম পূজ্যতম বেদব্যাস জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভাগবত আস্বাদনের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। ভাগবত কৃষ্ণ-লীলাময়। পাষাণ প্রাণ গলাইতে, নীরস প্রাণ সরস করিতে, ত্রিতাপ-দগ্ধ হৃদয় জুড়াইতে, জীবন-মরুভূমিতে শান্তির সুধা-নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিতে শ্রীমদ্ভাগবতই পরম সহায়। ভাগবত বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। চারিবেদ ও উপনিষদের অর্থ লইয়া ভাগবত লিখিত হইয়াছেন।

বেদান্ত-সূত্রের শ্লোক ও বিষয়াদিই ভাগবতে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। নারায়ণ ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী বলেন। ব্রহ্মা তাহা নারদকে উপদেশ করেন। নারদ

আবার তাহা ব্যাসদেবকে বলেন। নারদের নিকট চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব সূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ ভাগবত রচনা করিয়াছেন,

ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্র-ব্যাখ্যানুরূপ।
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রের যেই ঋক বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক শ্লোক-নিবন্ধ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোকে উপনিষদ কহে এক অর্থ॥

যে ভাগবত-পাঠে চণ্ডালাদি সকলেরই তুল্য অধিকার, ভাগ্যদোষে সেই ভাগবত-পাঠেও আজকাল অধিকারি-বিচারের কথা অনেকের মুখে শুনা যায়। হায়! কি দুঃখের কথা। ভাগবত ভক্তি-সাধনের (সাধন ভক্তির) একটী প্রধান অঙ্গ, ভক্তির অঙ্গ যাজনেও বাধা প্রদান বড়ই পরিতাপের বিষয়। শাস্ত্র ভাগবত-পাঠে সকলের সমান অধিকার, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন—

"সূতাদীনামধিকারঃ সকল-নিগমবল্লী-সৎফল-শ্রীকৃষ্ণনামবৎ" বেদরূপ কল্প-লতিকার পরমোৎকৃষ্টফল শ্রীকৃষ্ণ নামে যেমন সকলেরই সমান অধিকার, পুরাণ পাঠে ও তেমনই স্ত্রীশূদ্রাদির সমান অধিকার। স্বরূপ-দামোদর বঙ্গদেশীয় কবিকে উপদেশ দিয়াছেন,

"যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচ-রণে॥

ভক্তি-সাধনে জাতি-বিচার নাই, মাত্র ভক্তির বিচার,

"ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥

স্নেহ লেশ-মাত্রাপেক্ষা ঈশ্বর-কৃপায়।
স্নেহ-বশ চণ্ডাল করে স্বতন্ত্র আচার॥

জাতিভেদ অবশ্যই আছে, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের উহা একতম বৈশিষ্ট্য। বিকৃত রুচির দোষে আজকাল অনেকেই জাতিভেদকে হিন্দু জাতির অবনতির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। অনাদিকাল হইতেই এই জাতিভেদ আছে এবং থাকিবে। জাতিভেদ কেবল মনুষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, পশু-পক্ষীর মধ্যেও রহিয়াছে। জাতিভেদ যখন পূর্ণরূপে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখনই হিন্দুর গৌরব-রশ্মি সমুজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিয়াছিল। ত্রেতাযুগে মহারাজ দশরথ যখন অন্ধক-মুনির পুত্রকে অজ্ঞাতসারে বধ করিয়াছিলেন, তখন পুরোহিত বশিষ্ঠ-নন্দন বামদেব দশরথকে ব্রহ্ম-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তিনবার রাম নাম গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ নাম-মহিমার খর্ব্বতায় রাগান্বিত হইয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "যাও বামদেব পুত্র হওগে চণ্ডাল॥ একবার রাম-নামে কোটী ব্রহ্ম-পাপ হরে। তিনবার রাম-নাম বলালি রাজারে॥" যদি জাতিভেদ না থাকিত, তবে দশরথকে ক্ষত্রিয় এবং বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া শাস্ত্র বর্ণনা করিতেন না। ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ-ঋষি দশরথের পুরোহিত হইতেন না।

দ্বাপরযুগে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পাদ-প্রক্ষালনের জল দিয়া ব্রহ্মণ্য-ভক্তি জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। গীতায় চতুর্ব্বর্ণের কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ-জাতির মান নানা প্রকারেই বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীভগবান বিষ্ণু ব্রাহ্মণের পাদ-প্রহার আপন বক্ষে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কোন সময় ঋষিগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কে, এই বিষয় মীমাংসার ভার ভৃগুমুনির উপর ন্যস্ত করেন। ভৃগুমুনি বিষয়টী বুঝিবার জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন না। পিতামহ ব্রহ্মা ভৃগুকে তীব্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মুনিবর ভৃগু শঙ্করের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকেও প্রণাম করিলেন না। শঙ্করও ভৃগুর ব্যবহারে একান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ভৃগু ভীত-চিত্তে সে স্থান পরিত্যাগ

করিলেন। অনন্তর ভৃগুমুনি বিষ্ণুলোকে উপনীত হইলেন। ভগবান বিষ্ণু নিদ্রিত ছিলেন, চঞ্চলা কমলা শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ-সুখে অচঞ্চলা হইয়া তাঁহার পাদ-সেবা করিতেছিলেন। ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। ভগবান জাগ্রত হইয়া বিনয়-বচনে ভৃগুমুনির তুষ্টি-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের পদ-চিহ্ন আদর করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। এই প্রকারে ভগবান বিষ্ণু ব্রাহ্মণের মহিমা জগতে ঘোষণা করিয়াছেন।

আজকাল অনেকেই গীতার শ্লোকদ্বারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অনেকে ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। ব্রাহ্মণ বলিতেই আমরা পাচক-ব্রাহ্মণকে বুঝিয়া থাকি। এখনও যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানে জগতে শ্রেষ্ঠতম স্থানে সমাসীন, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না।

স্বনামপ্রসিদ্ধ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সার ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ, ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, লোকমান্য তিলক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতম মনস্বী বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত। ব্রাহ্মণজাতির অনন্য-দুর্লভ বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা এখনও সর্ব্বক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়।

প্রতিভান্বিত বাগ্মী-শিরোমণি বিবেকানন্দ যাঁহার কৃপা-প্রভাবে জগতে বরেণ্য, তিনিও ব্রাহ্মণ। শিক্ষিত-সমাজে তিনি পরমহংস বলিয়া বিখ্যাত, এমন কি স্থলবিশেষ অবতাররূপে পূজিত।

ধর্ম্ম-জগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। মহর্ষি বেদব্যাস, ভাগবত-ব্যাখ্যাতা শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহাশয়, ঋষিবর বশিষ্ঠ, দেবর্ষি নারদ—জগতে ইহাঁদের তুলনা নাই। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়া জগতে অদ্ভুত কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন। অগস্ত্য ঋষির কথা সকলেই জানেন, তাঁহার একটী অলৌকিক চরিত্র লিখিত হইতেছে। অগস্ত্য মহাতেজা তপস্বী ছিলেন। তিনি অনেক অলৌকিক ও বিস্ময়াবহ কর্ম্ম করিয়াছেন। একদা ঋষিবর ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পান, কতকগুলি বিপ্র ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির হইয়া রহিয়াছেন।

অগস্ত্য তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্রগণ কহিলেন, হে অগস্ত্য! আমরা তোমারই পূর্ব্বপুরুষ। তুমি দারপরিগ্রহ না করায় আমাদের বংশ-লোপের উপক্রম হইয়াছে। বংশ-রক্ষার জন্ত আমরা তপস্তা করিতেছি। অগস্ত্য সন্তানোৎপাদনে সম্মত হইলেন। কিছুদিন পর বিবাহ করিলেন। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে ধনের আবশুকতা অনুভব করিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা ইবল নামক একজন দুর্ব্বৃত্ত দানবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। দানবরাজের বাতাপি-নামে এক ভাই ছিল। অতিথি সমাগত হইলে ইবল মহাসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন। ছাগরূপধারী মায়াবী বাতাপিকে সংহার করিয়া তদীয় মাংসে অতিথি-সৎকার করিতেন। বাতাপির এক অদ্ভুত-শক্তি ছিল, ছাগ-মাংসরূপে অতিথির জঠরে প্রবেশ করিলেও অগ্রজের আহ্বান মাত্র অতিথির উদর বিদীর্ণ করিয়া বিনির্গত হইত। এইরূপে বহু অতিথির ধন-নাশে ইবল আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। অগস্ত্য ঋষি দানবরাজের অতিথি হইলে ইবল সমাদরের সহিত তাঁহাকে ছাগরূপী বাতাপির মাংস ভোজন করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ইবল যখন আহ্বান করিলেন, বাতাপি আসিলেন না। অগস্ত্য হাসিয়া বলিলেন, "বাতাপি আর নাই, আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়াছি।" ইবল অত্যন্ত ভীত হইলেন। মহর্ষির প্রসন্নতার জন্ত প্রার্থনারূপ ধন প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বযুগে ব্রাহ্মণগণ এইরূপ শক্তি-প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানযুগে ভগবান শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্তের টীকাকারগণের তুলনা জগতে নাই।

একশতবৎসর পূর্ণ হয় নাই, ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সে দিনের কথা, কাঠিয়া বাবা, জগদীশ-বাবাজী প্রভৃতি ভক্তির জলন্ত চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীভগবানের প্রিয় পার্ষদগণের কথা এখানে বলিলাম না। বড় দর্শনাচার্য্য, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, বৈদান্তিক শিরোমণি প্রকাশানন্দ, নৈয়ায়িক রঘুমণি, স্মার্ত্তাচার্য্য রঘুনন্দন প্রভৃতির তুলনা কোথায়?

মহাপুরুষ বলিয়া যাঁহারা সম্মানিত, তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ। ভারতের লুপ্ত গরিমা জাগ্রত করিতে হইলে আবার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-জাতির ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রত্ব, বৈশ্যের বৈশ্যত্ব ও শূদ্রের শূদ্রত্ব জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ববর্ণের দাসত্বই সাধারণ ব্যবসা হইয়াছে। পরের পদ-লেহন করিতে করিতে দেশ আত্ম-সম্মান ভুলিয়া গিয়াছে। দাসত্বে শুধু সমাজে নয়, ধর্ম্মেও পতিত হইতে হয়, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। দেশকে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম অনুসারে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল সুনিশ্চিত। একখানি চেয়ারের চারিটী পা না থাকিলে যেমন চেয়ার খানি দাঁড়াইতে পারে না, সমাজে ব্রাহ্মণাদি চারিটি জাতি না থাকিলে তেমনই দেশ দাঁড়াইতে পারেনা। ভক্তি-হীনতাই অবনতির মূল কারণ।

দেশের সব দিকেই অবনতি। যেখানে পুরুষ-জাতি পতিত, সেখানে স্ত্রীজাতির নিকট কি আশা করা যায়? কই সেই খনা, লীলাবতী, কই সে গার্গী, মৈত্রেয়ী, কই সেই সীতা সাবিত্রী। দেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। বিলাসিতা ও ধর্ম্মহীনতা দেশকে একবারেই পিছাইয়া দিয়াছে। স্ত্রীজাতির মধ্যে ভক্তি-ভাব যত সহজে জাগে, পুরুষে তেমন নহে। ইহঁাদিগকেও ভক্তি-ধর্ম্মে ব্রতী করিতে হইবে। কবি গাহিয়াছেন,

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা।
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষী মনীষি হইলেও একান্ত ভ্রান্ত—এই কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে।

গীতা-শাস্ত্রে অর্জ্জুনের এবং শ্রীকৃষ্ণের কথায় সর্ব্বত্র বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। গীতার প্রথমভাগেই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,

"দোষৈ রেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণ-শঙ্কর-কারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥

কুলঘ্নগণের এই সকল বর্ণ-শঙ্কর-কারক দোষে সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়।

"উৎসন্ন-কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥

কুলধর্ম্ম-উৎসন্ন হইলে নিয়ত নরকে বাস হইয়া থাকে, ইহাঁ আমরা শুনিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,

"স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥

স্বধর্ম্মের প্রতি অবলোকন করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্ম-যুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্য কোনই শ্রেয়ঃ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জাতি-ভেদ না থাকিলে অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয় বলার তাৎপর্য্য কি?

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা দোষপূর্ণ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

আমি গুণ-কর্ম্মের দ্বারা চারিবর্ণ সৃজন করিয়াছি। আমি চারিবর্ণের কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় এবং অকর্ত্তা বলিয়াই জানিবে। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কথাই বলিয়াছেন।

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাংগতিম্॥
"কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

হে পার্থ! পাপ-বংশ-সম্ভূত এবং স্ত্রী, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রও আমাকে আশ্রয় করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরমাগতি প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে আর কথা কি?

উপরোক্ত শ্লোক-সমূহে চারিবর্ণের কথা যদিও স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হই-

রাছে, তথাপিও গীতার দোহাই দিয়া জাতিভেদ অস্বীকার করা বড়ই দুঃখের কথা নহে কি ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু জাতিভেদ-প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে মান্য করিয়াছেন। মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে দশদিন কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করিলেন, কিন্তু ভিক্ষা (ভোজন) করিলেন ব্রাহ্মণের গৃহে। সন্ন্যাসের পরও প্রভু আমার চির-প্রচলিত সনাতন-জাতিভেদ-প্রথা লঙ্ঘন করেন নাই।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কিম্বা শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সময়ও কেবল ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করিয়াছেন। তবে একবার মাত্র এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে মহাপ্রভুর ভিক্ষার কথা গোস্বামি-শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মাধবেন্দ্র পুরীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্যই মহাপ্রভু সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করিয়াছেন। মাধবেন্দ্র-পুরীর সেই ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবাচার দর্শন করিয়া তাঁহার গৃহে ভোজন করিয়াছেন। এখানে মহাপ্রভু পুরী-গোস্বামীর মতেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন,

"পুরী গোঁসাইর যেই মত সেই মত সার"।

শ্রীমন্মহাপ্রভু হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষত্ব বেদ-প্রতিপাদ্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া উচ্ছৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দান করেন নাই। জাতিভেদ-প্রথাকে সর্ব্বতো-ভাবে, সর্ব্বাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তবে জাতি-ভেদের অন্যায় আব্দারও অভিমান পূর্ণরূপে দূর করিয়াছেন। কৃষ্ণ-ভক্ত চণ্ডালকেও (তজ্জাতিকে নহে) ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ দান করিয়া ভজন-বিমুখ ব্রাহ্মণকে (ব্রাহ্মণ জাতিকে নহে) চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াছেন।

ভক্তি-জগতে জন্মগত জাতিভেদের প্রাধান্য নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সনাতন জাতিভেদ অস্বীকার করা উচিত নহে। ভক্তি-সাধনে সকল জাতিই সমান অধিকারী, এই জন্যই ভক্তি-জগতে জাতিভেদের আদর নাই।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অবশ্যই আছে, যদি কেহ বর্ণ ও আশ্রমোচিত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করেন, তবে তিনি বর্ণ আশ্রম ধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়া থাকেন। ভাগবত-গ্রন্থও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

শ্রীচরিতামৃত বলিতেছেন,

"চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিতে সে৷ রৌরবে পড়ি মজে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি-জগতে জাতিকুলের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করেন নাই। ভজন দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব, জাতি দ্বারা নহে, মহাপ্রভুর ইহাই মত।

"যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনেতে নাহি জাতি-কুলের বিচার॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতো মনো বচনে হিতার্থং।
প্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানং॥

ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপ, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও শ্রুত এই দ্বাদশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণও যদি অরবিন্দনাভ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ-বিমুখ হন, তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত-মন চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করি। ভক্তিমান্ চণ্ডাল আপন কুলকেও পবিত্র করেন, কিন্তু ভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ আপনাকেও পবিত্র করিতে পারেন না। কুলকে পবিত্র করা ত অতি দূরের কথা।

ভক্তি দীপ্ত-অগ্নি-সদৃশ। দুর্জ্জাতি রূপ পাপ পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া থাকেন। ভক্তি-সম্পন্ন চণ্ডাল পণ্ডিতগণের পরম আদরণীয়। ভক্তিকে যে সমস্ত কর্ম্ম-যোগী শ্রেষ্ঠতম বলিয়া মানেন না, তাহারা অত্যন্ত হেয়। ভগবদ্ভক্তি-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণাদি উত্তম জাতি, বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্র-জপ ও তপস্যাদি মৃতদেহের ভূষণ-ধারণের মত লোকরঞ্জন মাত্র।

"শুচিঃ সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি দগ্ধদুর্জ্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোপি-নাস্তিকঃ॥
ভগবদ্ভক্তি-বিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপ স্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোক-রঞ্জনং॥

পদ্মপুরাণ বলেন, "চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-প রায়ণঃ" ইত্যাদি।

বিষ্ণুভক্তি-সম্পন্ন চণ্ডাল মুনি হইতেও শ্রেষ্ঠ। দ্বিজ, যদি বিষ্ণুভক্তি-বিহীন হন, তবে তিনি শ্বপচাধম, "চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ ভজে। বিপ্র নহে বিপ্র রৌরবে পড়ি মজে॥ সর্ব্ববর্ণে যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়, যে না ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।"

হিন্দু-শাস্ত্রের উদারতা, গভীরতা বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। তাই আমরা শাস্ত্রের গভীর অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেক সময়ই ভ্রান্ত-মতে পরিচালিত হইয়া থাকি।

মহাভারতে অজগর-পর্ব্বাধ্যায়ে জাতিভেদ সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা দেখা যায়। অজগরের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, জাতিভেদ অবশ্যই আছে, তবে কেবল জন্ম দ্বারাই জাতি বিচার নহে, জন্ম ও কর্ম্ম (গুণাদি) উভয়ই চাই। যদি কেহ জন্মগত ব্রাহ্মণ হন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ না থাকে, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়না। আবার কেহ যদি চণ্ডালও হন, আর তাঁহার মধ্যে অধিকতর রূপে সত্ত্বগুণ দৃষ্ট হয়, তবে তাঁহাকেও (তজ্জাতিকে নহে) ব্রাহ্মণ বলা যায়।

গুণের আদর সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে এই গুণের আদর সমধিক রূপে দৃষ্ট হয়। হিন্দুধর্ম্ম জাতি-ভেদ-প্রথাকে যেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন, তেমনই গুণের তারতম্যে ব্রাহ্মণও চণ্ডালাধম, চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, ইহাও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যবন হরিদাসকে শ্রাদ্ধ-পাত্র দান করিয়া জগতে ভক্তির গৌরব দেখাইয়াছেন। মহাপ্রভুও শ্রীহরিদাসকে বলিয়াছেন, নিরন্তর তুমি বেদ পাঠ করিতেছ। তোমার পূতস্পর্শে জগৎ পবিত্র।

মহাপ্রভুর সময়ও এই জাতিভেদ-প্রথা দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহা সুবুদ্ধিরায়ের মুখে করোয়ার (বদনার) পানি (জল) দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ, প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিলেন,—তপ্ত-ঘৃত খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে।

পূর্ব্বকালে লোক প্রাণকে ধর্ম্ম হইতে অধিক মনে করিত না। ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য অম্লানবদনে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। সুসভ্যতার নবীন আলোকে এখন আমরা শিখিয়াছি—প্রাণ-রক্ষার জন্য মিথ্যা বলিতেও দোষ নাই। হায়রে, নবীন শিক্ষা! ধন্যরে মুলভ্যতা!

যবনের জল মুখের মধ্যে প্রবেশ করায় তাৎকালীন ব্রাহ্মণগণ প্রাণ-বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা দিলেন, হায়রে! আজকাল অবাধে হিন্দু-সমাজে যবনের জল কেন, অন্ন পর্য্যন্তও চলিতেছে। কেহ কেহ বা ম্লেচ্ছ-পক্ক অন্ন আহার করিয়া পিতৃ-পিতামহের নাম উজ্জ্বল করিতেছেন।

সুবুদ্ধিরায় ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। মহাপ্রভু তখন, বারাণসী। মহাপ্রভু সুবুদ্ধিকে বলিলেন, প্রাণ পরিত্যাগ করিবে কেন, একবার কৃষ্ণ নাম বল, সমস্ত পাপ দূরীভূত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ-নামের অপার মাহাত্ম্য অবোধ আমি কি বুঝিব? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে নামের মহিমা দেখিতে পাই, একটী পাপ নহে, এক জীবনের পাপ নহে, কোটী-জন্মের পাপও একটী মাত্র কৃষ্ণ-নামে বিদূরিত হয়,

"প্রভু কহে উঠ তুমি কৃষ্ণ-নাম লইলে।
কোটী জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥"

সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,

"জয়তি জয়তি নামানন্দ রূপং মুরারেঃ
বিরমিতনিজধর্ম্ম ধ্যানপূজাদি যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণীনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

যিনি বর্ণাশ্রমিগণের কর্ম্ম, ধ্যান-পরায়ণ জনগণের মনোনিগ্রহ, অর্চ্চনাপর সাধকগণের পূজোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট নষ্ট করিয়াছেন, সেই ভুবনমঙ্গল নামানন্দরূপী মুরারির জয় হউক, জয় হউক। যে কৃষ্ণনাম লইলে কেবল আনন্দই বর্দ্ধিত হয়, "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং" যে নামের মূলে অনন্ত আনন্দ রোপিত হইয়াছে, যে নাম প্রকাশিত হইয়া নিজের অপার মাহাত্ম্য-গুণে ধ্যান, পূজা, ধর্ম্ম, যজ্ঞ ও কর্ম্মাদি সর্ব্ববিধ সাধনের মহিমা খর্ব্ব করিয়াছেন—সেই ভুবন-মঙ্গল নামের জয় হউক। "হরের্নামৈব কেবলং" শ্লোকে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ-নাম ব্যতীত অন্য সাধন (কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি) খণ্ডিত হইয়াছে,

"কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত উদ্ধার॥

দার্ঢ্যলাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
কেবল শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান, যোগ, তপ, কর্ম্ম আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাস্তি নাহি নাহি তিনবার এবকার॥

যে নাম মাত্র একটীবারও যে কোন প্রকারের "সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" গ্রহণ করিলে জীবকে পরামুক্তি অর্থাৎ প্রেমসেবা প্রদান করেন, সেই নাম জয়যুক্ত হউন।

মুক্তি ও পাপ-নাশ নামের মুখ্য ফল নহে, "আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।" যে নাম অমৃতেরও সার, "অমৃত হৈতে পরমামৃত" সেই সুধা-মধুর শ্রীকৃষ্ণ-নাম আমার জীবন ও ভূষণ-স্বরূপ। এই অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-নামই আমার একমাত্র গতি। আমি যেন বদন ভরিয়া সর্ব্বদা প্রেমানন্দে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম বলি। আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন শ্রীকৃষ্ণ-নামের (হরিনামাক্ষরের) ভূষণ পরিধান করি। আমার অন্তর ও বাহির যেন নামের ভূষণে বিভূষিত হয়। অসার ভূষণে জড়ীয় দেহকে পুষ্ট করিয়া যেন সুখী না হই। সর্ব্বদা যেন আপনা ভুলিয়া বলি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। এই শ্লোকটীতে কর্ম্ম জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ফলতঃ ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। ভক্তি রসবিশেষ। ইহা পান করিলে নিরন্তর কর্ণ, বাক্য ও অন্তরের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। ভক্তি ভবরোগের মহৌষধি। ইহা কৃষ্ণ-প্রেম-জনিত মত্ততা, অন্ধতা ও মোহ প্রভৃতি উৎপাদন করেন। বারম্বার আস্বাদিত হইলে অশেষ রস প্রদান করিয়া থাকেন। ইহা দেহাদির পুষ্টিকর ও অমৃত-স্পৃহাহর, ইহা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় এবং অনন্ত অমৃতের আকর। ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য বর্ণনে কাহারও ক্ষমতা নাই। ইহা অতুলনীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণশালী। ভক্তি ত্রিজগতে অনুপমেয়।

মহাপ্রভু জাতি-নাশের পাপ স্বীকার করিতেছেন। তবে শাস্ত্র বলেন, মহাপ্রসাদ ভক্ষণে বৈষ্ণবে জাতির বিচার নাই। মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব ও শ্রীনামে অল্প পুণ্যবান জীবের বিশ্বাস হয় না।

বর্ত্তমানে সমাজের নিদারুণ দুরবস্থা। কেহ কেহ জাতি-ভেদ মুখে স্বীকার করেন না, যাহার তাহার হাতে গাড়ীতে, জাহাজে ভোজন করেন। কিন্তু আবার সম্মান নষ্টের আশঙ্কায় জলচল শূদ্রের গৃহেও খান না। এই সমস্ত হতভাগ্যের ধর্ম্মের ভয় নাই, ভয় সম্মানের।

আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাঁহারা কেবল জাতির গৌরবেই উন্মত্ত। ভক্তিতে তাঁহাদের শ্রদ্ধার লেশ মাত্র দৃষ্ট হয় না। জাতিগত সম্মান মাত্র ইহলৌকিক, পারলৌকিক নহে, ইহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। সৎ-জাতির ফলে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ হয় না, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম পাইতে মাত্র ভক্তিই সাপেক্ষ। শ্রীমদ্ভাগবতে যজ্ঞ-পত্নীর অন্ন-ভিক্ষা প্রসঙ্গে এই বিষয়টী সুন্দররূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়া সখাগণকে প্রেরণ করিলেন, যজ্ঞের ধূমে অন্ধ (কর্ম্মযোগী) ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন প্রদান করিলেন না। রাখালগণ একান্ত বিষণ্ণ-বদনে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রত্যাখ্যান নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক-গতির অনুসরণ করিয়া বলিলেন, সখাগণ দুঃখিত হইও না, যাচক ব্যক্তির মান শোভা পায় না। মানকে পশ্চাতে এবং অপমানকে সম্মুখে রাখিয়াই প্রার্থনা করিতে হয়। তোমরা ব্রাহ্মণগণের ভক্তিমতী পত্নীগণের নিকট গমন করিয়া অন্ন প্রার্থনা কর, অবশ্যই ব্রাহ্মণীগণ অন্ন প্রদান করিবেন।

গোপ-শিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে যজ্ঞ-পত্নীগণের গৃহে গমন করিলেন। দ্বিজ-পত্নীগণ তখন রন্ধন সমাপন করিয়া শ্রীভগবানের নামে ভোগ নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা অলঙ্কৃতা অবস্থায় আপনাদের ভাগ্যই (আমরা সধবা) যেন প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা কেবল স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা নহে, অশ্রু, কম্পাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাব-রূপ অলঙ্কারেও সুশোভিতা। তাঁহাদের নয়ন হইতে অবিরত মুক্তামালার মত অশ্রু ঝরিতেছে। কৃষ্ণ-গুণ-লীলা বর্ণনে তাঁহাদের রসনা নৃত্য করিতেছে। কৃষ্ণ-রূপ হৃদয়ে উদিত হওয়ায় তাঁহাদের দেহ কম্পিত হইতেছে। তাঁহারা কৃষ্ণ-কথায় বিভোর। কেহ বলিতেছেন, হায়, হায়! আমাদের জীবন ত কাটিয়া গেল, নন্দকুল-চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণ-বদনের মধুরিমা দর্শনের ভাগ্য ঘটিল না। বংশীগানামৃতের আধার-স্থল গোপীনাথ নীলকমলের

চন্দ্রবদন দর্শন করিলাম না। লাবণ্যামৃতের জন্মস্থান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বদনের মধুরিমা আস্বাদন, আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। আমাদের পাপ-নয়নে শত ধিক্। হায়রে! আমাদের দেহেন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-অভাবে একান্তই বিফল হইল। হায়রে! কোটী অমৃত তরঙ্গিণী শ্রীকৃষ্ণের সুধা-মাখা-বাণী আমাদের শ্রবণ-গোচর হইল না। আমাদের শ্রবণকে ধিক্। আমাদের শ্রবণ কাণা-কড়ির তুল্য। যদি কৃষ্ণ-কথাই শ্রবণ না করিলাম, তবে আর শ্রবণের সার্থকতা কি? হায়রে হায়! মৃগমদ ও নীলোৎপল-মিলনের পরিমল বিনিন্দিত শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ আমরা আঘ্রাণ করিলাম না। আমাদের নাসিকাকেও শত ধিক্। আমাদের নাসিকা নিশ্চয়ই ভস্ত্রার (কামারের জাঁতার) সমতুল্য। সুধার আস্বাদ বিস্বাদকারী শ্রীকৃষ্ণের সুধামধুর অধরামৃত, শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব গুণাবলী ও সুপবিত্র চরিত্রের মধুর আস্বাদ আমরা উপভোগ করিলাম না। আমাদের জিহ্বা ভেক-জিহ্বা হইতেও হেয়। ভেক, জিহ্বা দ্বারা যেমন কোনই স্বাদ-গ্রহণ করিতে পারে না, আমরাও তেমনই শ্রীকৃষ্ণ-চরিতামৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারি না। ভেক ডাকিয়া মাত্র কাল-সর্পকে আহ্বান করে, আমরাও বিষয়-কথা বলিয়া কাল-সর্পকেই আহ্বান করিতেছি। কাল কাটিয়া যাইতেছে। কাল, নদীর স্রোতের মত অনবরত শুধুই চলিতেছে। কাল অনাদি, কাল নিত্য। আমাদের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, কিন্তু আসা যাওয়ার নিবৃত্তি ঘটিতেছে না। আমাদের মৃত্যু আছে, কিন্তু মৃত্যুর পর পরেই আবার জীবন। জীবনের পর আবার মৃত্যু। আমরা নিত্যই এই অক্ষয় কাল-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। পূর্ব্বাকাশে উষার মধুর কিরণ বিস্তার করিয়া রাঙ্গা-ছবি-রবি উদিত হন, (রসিক-অরুণ যেন প্রিয়তমা পূর্ব্ব-দিগাঙ্গনাকে আরক্তিম অলক্ত-রাগে সুরঞ্জিত করেন) আবার পশ্চিম গগনে অস্তমিত হন। আমাদেরও জীবনরূপ সূর্য্যের কালরূপ আকাশে কেবল উদয় ও অস্ত—কেবলই আসা যাওয়া। হায়, হায়! আমাদের সেই শুভদিন কখন হইবে, যেই দিন চিরদিনের তরে আসা যাওয়ার নিবৃত্তি হইবে? হায়! আমরা কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দের মধুর মকরন্দ পান করিয়া কৃতার্থ হইব?

হায়, আমাদের কবে সেই সৌভাগ্য হইবে, আমরা কোটীচন্দ্র-সুশীতল শ্রীকৃষ্ণ-পদতলের সুখ-স্পর্শ লাভ করিব? শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্পর্শমণি-তুল্য অঙ্গস্পর্শ-

পাছে আমাদের লৌহ-দেহ কবে কাঞ্চন হইবে? যজ্ঞপত্নীগণ করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন, শ্রীবিগ্রহের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের জড়-জগতের দিকে একটুও লক্ষ্য নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর-মাধুর্য্য-সাগরে যেন কখনও ভাসিতেছেন, কখনও বা ডুবিতেছেন।

গোপ শিশুগণ যজ্ঞপত্নীগণকে সেই অবস্থায় অবলোকন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক বিনীত ভাবে বলিলেন, হে বিপ্রপত্নীগণ! আপনারা দয়া করিয়া আমাদের কথা শ্রবণ করুন, নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে আপনাদের অনতিদূরে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছেন, আপনারা ক্ষুধিত কৃষ্ণ-বলরামকে অন্ন প্রদান করুন।

শ্রীকৃষ্ণ-কথায় আকৃষ্ট-চিত্তা নিত্য তদ্দর্শনোৎসুকা বিপ্র-পত্নীগণ অচ্যুত (যাহা হইতে চিত্ত চ্যুত হয় না) অতি নিকটে আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা স্বগত বলিতে লাগিলেন, রে পামর মন! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দারুণ ক্ষুধার কথা শ্রবণ করিয়া এখনও মূর্চ্ছিত না হইয়া জীবিত আছ, ধিক্ তোমাকে। এই প্রকারে তাঁহারা আপনাদিগের মনকে বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞ-পত্নীগণ চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি চতুর্ব্বিধ স্বাদ-বিশিষ্ট বহুগুণ-সম্পন্ন অন্ন ব্যঞ্জন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। নিম্নগামিনী তরঙ্গিণী যেমন সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হয়, তাঁহারাও সেই প্রকার আকুলপ্রাণে ছুটিলেন। পতি, পিতা ও মাতা প্রভৃতি গুরুগণ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা গুরুগণের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন—সেই পিতা পিতা নহে, সেই মাতা মাতা নহে, সেই গুরু গুরু নহে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-পথে কণ্টক হন,

"ন যে ন মাতা, ন যে ন পিতা, ন যে ন গুরুঃ কৃষ্ণভক্তিনিষেধকঃ।"

বহুকাল হইতেই যজ্ঞ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য আকুলা ছিলেন, আজ তাঁহাদের আশাতরু শুধু মুকুলিত নহে পল্লবিতও হইয়াছে।

যজ্ঞ-পত্নীগণ দেখিতে পাইলেন, যমুনা-তীরস্থ নব নব পল্লব-পরিশোভিত

অশোক-কাননে গোপগণ পরিবৃত হইয়া অগ্রজ বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন। অশোক-কানন শব্দে শোক-হীনতা ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে শোক, দুঃখ নাই। সেখানে নিত্য সুখ প্রকটিত।

"বচনের অগোচর, বৃন্দাবন-ধামবর
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দ ঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরা-মৃত্যু দুঃখ
কৃষ্ণ-লীলা-রস অনুক্ষণ॥

যজ্ঞ-পত্নীগণ নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণ-রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নবীন-নীরদের শোভা-বিজয়ী। তাঁহার পরিধানে দিব্য তড়িত মালার মত পীতাম্বর। চরণচুম্বি বনমালা লম্বিতভাবে তাঁহার হৃদয়ে দুলিতেছে। ময়ূরপুচ্ছ গৈরিকাদি-ধাতু নব কিশলয়াদি দ্বারা তাঁহার মস্তক সুশোভিত। চূড়ার কি মাধুরী! শ্রীকৃষ্ণ নব নটবরবেশে দাঁড়াইয়া পার্শ্বস্থিত সুবল-সখার স্কন্ধে বাম হস্ত বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তে লীলা-কমল ঘূর্ণন করিতেছেন। কর্ণদ্বয়ের উৎপল, কপোলের অলকা এবং বদনকমলের মনোহর হাস্য, শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব মাধুরী বিকীরণ করিতেছে। ধরাতলে যেন অপূর্ব্ব শশধরের উদয় হইয়াছে। এই চাঁদের হস্ত পদাদি অবয়ব আছে। যে সমস্তও যেন এক এক পূর্ণ চাঁদ। বদন চাঁদের তুলনা নাই। দর্শন করিলে তনু মন ক্ষোভিত হয়। উপভোগের ইচ্ছা জন্মে। অন্য রস বিস্মৃত করিয়া দেয়, জগতকে আত্মবশ করে। লজ্জা-ধর্ম্মাদি থাকে না। আবার অধরের কি মধুর মাধুরী? ত্রিজগৎ-দুর্লভ এই সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে সকলেই বিমোহিত হয়। স্ত্রীলোক দূরের কথা, পুরুষকেও এই মদনমোহন রূপ আকর্ষণ করে।

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বর কি গম্ভীর। নবঘনের ধ্বনি কি সেই কণ্ঠ স্বরের নিকট লাগে? কোকিল-কুল লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করে।

শ্রীকৃষ্ণের পদের নূপুর কি মধুর স্বরে বাজিতেছে? নূপুর যেন পাদপদ্মের মধু খাইয়া বিভোর হইয়াছে।

লীলা-কমল-ঘূর্ণনে শ্রীকৃষ্ণ যেন প্রকাশ করিতেছেন, হে যজ্ঞ-পত্নীগণ, সংকোচ-ভাববতী তোমাদের হৃদয়-কমল হস্তগত করিয়া [illegible] দ্বারা ঘূর্ণিত করিতেছি। অথবা মধুর-ভাববতী তোমাদিগকে [illegible] করিয়া আত্মস্থ

হৃদয়-কমলও ঔৎসুক্য-সহকারে ঘূর্ণিত হইতেছে। যজ্ঞ-পত্নীগণের তখন নায়িকা-ভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণীগণ শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ-সন্দর্শনে একান্ত বিমোহিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন,

"কাঁহা সে চূড়ার ঠান, শিখীপিঞ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যাম তনু॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণ-তনু যেন আম্রের আঠা।
নারী-মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমাল-দ্যুতি, ইন্দ্রনীল সম কান্তি
যে কান্তি জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গার-রস সার ছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না সানি
জানি বিধি নিরমিল তায়॥"

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ শ্রবণে কৃতার্থ দ্বিজ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ-মাধুরী-সন্দর্শনে বিমোহিতা হইলেন। নয়ন-যুগলদ্বারা সেই অনুপম শ্রীমূর্ত্তিখানি অন্তঃকরণে আনয়ন করতঃ প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সুষুপ্তি-সাক্ষী প্রাজ্ঞ সন্নিধানে জীবের অহংবৃত্তি লীন হইলে যেমন পরম নিবৃত্তির উদয় হয়, ব্রাহ্মণ-পত্নীগণও তেমনই শ্রীকৃষ্ণরূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সন্তাপ ত্যাগ করিলেন। সন্তাপ অর্থে—বিরহের তাপ—ত্রিতাপ নহে। ভক্তি-পথে প্রবিষ্ট হইলেই ক্রমে ত্রিতাপ বিদূরিত এবং অনর্থ-নিবৃত্তির পর নিষ্ঠা, রুচি ইত্যাদি উপজাত হয়। দ্বিজ-পত্নীগণ, শ্রদ্ধা, সৎসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, নিষ্ঠা, রুচি, ভাব, আসক্তি প্রভৃতির স্তর অতিক্রম করিয়া প্রেম-ধনে ধনী হইয়াছিলেন। সুতরাং তখন তাঁহাদের কোন প্রকারেই ত্রিতাপের জ্বালা থাকিতে পারে না। কোটি বাড়বানলের জ্বালা হইতেও অধিক বিরহ-তাপ ত্রিতাপকে সমূলে ধ্বংস করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রেম-লাভের ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন,

"কোন ভাগ্যে কারো শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সৎসঙ্গ করয়॥
সাধু-সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজায়॥
রুচি হৈতে জন্মে ভক্ত্যে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই প্রীতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম-নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥"

কোন ভাগ্য—পুণ্যজনিত নহে, মহৎকৃপা-প্রসূত। রাসভিসারিণী গোপ-রমণীগণের মত দ্বিজ-পত্নীগণ অখিল আশা পরিহার করিয়া দর্শন-লালসায় আগমন করিয়াছেন দেখিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইলেন। প্রসন্ন-বদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে ভাগ্যবতীগণ, তোমাদের আগমন শুভ। তোমরা যে কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া আমাদের দর্শনের জন্য আসিয়াছ, ইহা উচিতই হইয়াছে।

আমাদিগকে দেখিবার জন্য তোমরা বড়ই পথ-ক্লেশাদি পাইয়াছ, আমরা কিন্তু সুখেই বসিয়া রহিয়াছি। বড়ই ক্লেশ সহ্য করিয়া আসিয়াছ, নিকটে আসিয়া উপবেশন কর। তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে আমি অসমর্থ। তোমরা ভাগ্যবতী, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ভক্ত, ভগবানের দুর্লভ দর্শনের নিমিত্ত যে পথ-শ্রমাদি ক্লেশ ভোগ করেন, শ্রীভগবান তাহা ভাবিয়া একান্ত মুগ্ধ হন। ভক্তকে আপনার দেহ দান করিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি হয় না। তিনি ভক্তের গুণ-বর্ণনায় কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য-লীলায় এই ভাবটী অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে পথ-ক্লেশ সহ্য করিয়া নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রতি

বৎসরই মহাপ্রভুকে দেখিতে যাইতেন। এক বৎসর মহাপ্রভু ভক্তগণকে বলিলেন,

"প্রতি (বর্ষে) আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পায় বহু মতে॥
তোমা সবার দুঃখ জানি; নারি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গ-সুখ লোভ বাড়ে চিত্তে॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়েতে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন তাঁরে কি পারি বলিতে॥
আইসেন আচার্য্য গোসাঞি মোরে কৃপা করি।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি শুধিতে না পারি॥
মোর লাগি স্ত্রী পুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আস্যেন ধাইয়া॥
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর তোমা সবা লাগিয়া॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমি নাহি রাজ্য ধন।
কি দিয়া তোমা সবার ঋণ করিব শোধন॥
দেহ মাত্র ধন সবায় কৈনু সমর্পণ।
তাঁহা বিকাই যাহা বিকাইতে তোমার মন॥
প্রভুর বচনে সবার আর্দ্র হৈল মন।
অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কান্দিতে কান্দিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন"॥

ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপানুগ্রহের প্রকাশ ভাষার দ্বারা হয়না। হায়! হায়রে! এমন দয়ার সাগর, পরম ভক্তবৎসল শ্রীভগবানকে ভজন করিলাম না। নির্লজ্জ প্রাণ কেন বাঁচিয়া আছে, ভজন-হীন এই অসার জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু কোটি গুণে বাঞ্ছনীয়! হায়রে! জীবন-নদীতে ত কেবল কামনার অশেষ তরঙ্গ উঠিয়াছে। উহার তরঙ্গের আঘাতে যে কূলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে! হায়, উপায় কি?

পতিত-পাবন-অবতারে বড়ই ভরসা করিয়াছিলাম, এবার অবশ্যই দুর্দ্দিনের অবসান হইবে। আর শঙ্কা নাই, শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবন বিজয়ী ডঙ্কা বাজিয়াছে। হায়রে! এমন দুর্গত-পাবন-অবতারেও মন্দভাগ্য আমি চিরবাঞ্ছিতই রহিলাম। বৈষ্ণবাপরাধের ফলে জীবন যে ক্রমেই জীর্ণ, শীর্ণ হইতেছে। জগাই মাধাই অশেষ পাপ করিলেও তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ ছিল না, প্রভু আমার এই গুণ লইয়া তাঁহাদের প্রতি পরম করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হায়রে, আমি যে হিতে বিপরীত করিতেছি। বৈষ্ণব সঙ্গের ফলে যে কেবল বৈষ্ণবাপরাধই সঞ্চিত হইতেছে। কারণ দেখিয়া কার্য্য অনুমান করা যায়, আমি যদি বৈষ্ণব অপরাধী না হইব, তবে এমন দয়াল অবতারেও প্রেম-ধনে বঞ্চিত থাকিব কেন? মধুর গৌর-অবতারে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে জগৎ ভাসিয়া গেল, একমাত্র আমি বঞ্চিত হইলাম। মহাপ্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একমাত্র আমার মত বৈষ্ণবাপরাধীকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিজগৎ উদ্ধার করিবেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলিতেছেন,

"মদ্যপ যবনে প্রভু করয়ে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥

মদ্যপকে মন্দ বলি, মৎস্য-ভোজীকে ঘৃণা করি, কিন্তু তাঁহারা যে আমার অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা ভাবিনা। মদ্যপ সর্ব্বদা মদের নিশায় মত্ত থাকেন, বৈষ্ণব-অপরাধ সঞ্চয়ের তাঁহার সময় নাই। কিন্তু আমি যে মালা-তিলক ধারণ করিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে যাইয়া কেবল অপরাধই সঞ্চয় করিতেছি। হায়, আমার উপায় কি হইবে? পতিত-পাবন বৈষ্ণবগণ নিজগুণে এই অজ্ঞান অপরাধীকে ক্ষমা করুন, দন্তে তৃণে ধারণ করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজ-পত্নীগণকে বলিলেন, যথার্থ বিবেকিগণ তাঁহাদের প্রিয় আত্মা আমার প্রতি সাক্ষাৎ ফলানুসন্ধান-রহিত অকপট ভক্তি করিয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী-শিরোমণি ব্রজ-রমণীগণের মনোবাসনা যদি উপস্থিত হইবা মাত্রই পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে রসভাবের সম্যক্ পুষ্টি সাধন হইত না। রসপুষ্টি ব্যতীত লীলায় চমৎকারিত্ব রক্ষিত হয় না। এ বিষয় বুঝার একটি উপাখ্যান শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, এক রাজা অপুত্রক ছিলেন। রজনি করিয়া

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর একটী পুত্র লাভ করেন। তনয়ের যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন একদল দস্যু তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। রাজা একান্ত শোক-বিমূঢ় হইয়া পড়েন। রাণীর দুঃখের কথা বর্ণাতীত। রাজা ও রাণী দুঃখিত মনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আহারে রুচি নাই, চক্ষুতে নিদ্রা নাই। আছে কেবল রোদন। পুত্র-প্রাপ্তির জন্য তাঁহারা শ্রীভগবানের ভজন আরম্ভ করিলেন।

একদিন এক দৈবজ্ঞ রাজগৃহে অতিথি হইলেন। মহারাজা তাঁহাকে কাতর প্রাণে পুত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন, মহারাজ, আপনি কাঁদিবেন না। রাজপুত্র বাঁচিয়া আছেন।

দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া মহারাণী দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। পুত্রের অবস্থিতির বার্ত্তা জানিবার প্রার্থনা করিলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন, আমি এখন সে সমস্ত কিছুই বলিব না। এক বৎসর পর রাজ-পুত্রকে আনিয়া দিব। মহারাজাও সেই মুহূর্ত্তেই পুত্রের বার্ত্তা জানিবার জন্য কতই কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু দৈবজ্ঞ তাহা শুনিলেন না। মহা-রাজকে প্রবোধ দিয়া দৈবজ্ঞ গৃহে গমন করিলেন।

দৈবজ্ঞ একদিন দস্যুদলের গ্রামে গমন করিলেন। দস্যুগণ আপনাদের ভূত-ভবিষ্যৎ প্রশ্ন করিতে লাগিল। দৈবজ্ঞ যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহাই সত্য হইল। দৈবজ্ঞের গণনায় মুগ্ধ হইয়া দস্যুগণ তাঁহাকে অতিশয় যত্ন করিয়া গ্রামে রাখিল। দৈবজ্ঞের মনোবাসনা পূর্ণ হইল।

প্রতিদিনই দস্যুগণ দৈবজ্ঞের নিকট আসে। সকলেই আপনাপন ভাগ্য বিষয় প্রশ্ন করে। একদিন সর্ব্বশেষে একটী যুবক আপনার হাত দেখাইলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন, তুমি রাজা হইবে। যুবক বিস্মিত হইলেন? ভাবিলেন লোকটা কি পাগল?

পরদিনও আবার যুবক আপনার ভাগ্য বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, দৈবজ্ঞ হাসিয়া বলিলেন, বলিয়াছি ত, তুমি রাজা হইবে। যুবক সে দিন বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

দৈবজ্ঞকে বিদ্রূপ করিবার জন্য যুবক প্রতিদিনই সর্ব্বশেষে তাঁহাকে হাত দেখাইতে লাগিলেন। আর একদিন দৈবজ্ঞ হাসিয়া বলিলেন, রাজা হইবার

আর তোমার বিলম্ব নাই। তুমি শুধু রাজা হইবে এমন নয়, তুমি রাজাই ছিলে।

দৈবজ্ঞের এই বাক্য সে দিন যুবকের হৃদয়-তন্ত্রীতে বড়ই লাগিল, যুবক শিহরিয়া উঠিলেন। আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন, দৈবজ্ঞের কথা ত মিথ্যা হয় না, তিনি যাঁহাকে যাহা বলেন, তাহাই ত সত্য হয়। এই বিষয়ের মধ্যে কি কোন নিগূঢ় রহস্য রহিয়াছে? যুবক আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে সে দিন গৃহে গমন করিলেন।

পরদিন আবার যুবক দৈবজ্ঞকে হাত দেখাইলেন। দৈবজ্ঞ আবার বলিলেন, বলিয়াছিত, তুমি রাজা ছিলে, সত্বরই আবার রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিবে। যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দৈবজ্ঞের চরণ জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দৈবজ্ঞ যুবককে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, "তুমি রাজপুত্র ছিলে, দস্যুগণ পঞ্চমবর্ষ বয়সে তোমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। অপুত্রক দস্যুপতি তোমাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছে"। সাবধান, এই কথা প্রকাশ করিও না। দস্যুগণ, তুমি ইহা জানিতে পারিয়াছ বুঝিলে তোমাকে প্রাণে বধ করিবে। যুবক কাঁদিয়া ফেলিলেন, নয়ন-জলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। যুবক, পিতা মাতা জীবিত আছেন কি না জানিতে চাহিলেন, দৈবজ্ঞ সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

যুবক সে দিন আবার চলিয়া গেলেন। নিজের চরিত্র এবং দস্যুগণের চরিত্রের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া বুঝিলেন, দস্যুগণের চরিত্রে এবং তাহার চরিত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ। যুবক দৈবজ্ঞের কথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিলেন। জনক-জননীকে দেখিবার জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। পরদিন দৈবজ্ঞের নিকট মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন, তুমি ভাবিও না, কল্যই তুমি তোমার পিতামাতাকে দেখিতে পাইবে। যুবক, বড় আশায় হৃদয় বাঁধিয়া সে দিনও চলিয়া গেলেন।

দৈবজ্ঞ সেই দিনই রাজভবনে গমন করিলেন। সৈন্যগণ লইয়া দস্যুদলকে আক্রমণ করিলেন। দস্যুগণ পলাইয়া গেল। সৈন্যগণ রাজপুত্রকে লইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। রাজা ও রাণী পুত্রকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন।

মহারাজা দৈবজ্ঞকে বলিলেন, আপনি পুত্রের সংবাদ জানিয়াও তাহাকে আনিতে এত বিলম্ব করিলেন কেন? দৈবজ্ঞ বলিলেন—মহারাজ, আমি যদি প্রথমেই আপনার পুত্রকে আনিয়া দিতাম, তবে রস-পুষ্টি হইত না। আপনার পুত্র যখন রাজপুত্র বলিয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে আপনার নিকট আনিয়াছি। আপনার পুত্রের এবং আপনার পরস্পরের যদি ভাব-বৃদ্ধি না হইত, তবে পুত্রকে পাইয়াও আপনি সুখী হইতে পারিতেন না। রাজা পুত্রকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। দৈবজ্ঞকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিলেন।

শ্রীভগবান্ দ্বিজপত্নীগণের প্রেমবশ হইয়াও অকস্মাৎ-লীলা-শক্তির ঐশ্বর্য্য প্রকাশে তাঁহাদিগকে গৃহে প্রেরণের ইচ্ছা করিলেন। যদিও প্রায়ই প্রেমিক জনের নিকট ঐশ্বর্য্য নিজ শক্তি প্রকাশ করিতে পারেন না, তথাপি লীলা-সৌষ্ঠবের জন্য বিরহোৎকণ্ঠা দ্বারা দ্বিজপত্নীগণের প্রেম-পরিবর্দ্ধনার্থ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই প্রকারে ঐশ্বর্য্য-শক্তি কৌশলে নিজ প্রভুর সেবা করিয়া কৃতার্থা হন। ব্রজে ঐশ্বর্য্য-শক্তি পরিত্যক্তা সাধ্বী স্ত্রীর মত গোপনে অবস্থান করেন, সময় বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়া থাকেন। দ্বিজপত্নীগণের রতিভাবের প্রশমনে বিবেক উৎপাদন জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সংকল্প। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজপত্নীগণের বৈরাগ্য ভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করিলেন। তিনি দ্বিজ-রমণীগণকে বলিলেন, হে সাধ্বীগণ, কেবল তোমরাই যে আমাকে ভক্তি কর, এমন নহে। অন্য বহু ভক্তগণও আমি পরমেশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি করিয়া থাকেন। তাঁহারা কুশল ও চতুর। জগতে স্বার্থ-সাধক ব্যক্তিকেই চতুর বলা হয়। স্বীয় ফলাভিসন্ধান-রহিতা, প্রীতি-ব্যবধায়ক জ্ঞান ও কর্ম্মাদি শূন্য যে অহৈতুকী-প্রেম তাহাই উত্তম।

নিজ প্রিয়-দেহ অপত্যাদিতে জীব যেমন অকপট প্রেম করিয়া থাকে, ভক্তগণও তেমনই আমাকে অকপট প্রীতি করেন।

এখানে উত্তমা-ভক্তির কথা বলা হইয়াছে,

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান (সোঽহং) ভাগবৎ-জ্ঞান নহে। কর্ম্ম বলিতে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, ভগবৎ-পরিচর্য্যাময় কর্ম্ম নহে।

ঠাকুর-মহাশয় লিখিয়াছেন,

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণ সেবা না পূজিব দেবী দেবা
এই ভক্তি পরম কারণ॥

এখানে দেবী দেবা অর্থ; শিব ও পার্ব্বতী প্রভৃতি। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ, দেব দেবীর মধ্যে নহে, স্বয়ং ভগবান। এক অভিন্ন-তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অবলাগণ, পরমাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একান্ত প্রিয়। ফলতঃ যাঁহার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, দারা, অপত্য, জ্ঞাতি ও ধনাদি প্রিয় হইয়া থাকে, তাঁহার অপেক্ষা জীবের প্রিয় আর কে হইতে পারে?

বুদ্ধি-প্রবেশের জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, বস্তুতঃ দেহাদি হইতে পরমাত্মা অতিশয় প্রিয়। দেহে প্রাণ না থাকিলে সেই দেহের কোনই আদর নাই। পরমাত্মার সম্পর্কেই দেহ প্রিয় হয়। জীবাত্মা, পরমাত্মার অংশ বলিয়া উভয়ে প্রীতি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার দেহে অবস্থান-বিষয়ে শাস্ত্র বলেন, একটী বৃক্ষে যেমন দুইটী পক্ষী থাকে, একটী বৃক্ষের ফলাদি ভোজন করে, অন্যটী ভক্ষণ করে না, মাত্র সাক্ষী স্বরূপে অবস্থান করে, তেমনই জীবাত্মা ফলভোগী, পরমাত্মা নির্লিপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ব্রাহ্মণীগণ, তোমরা এক্ষণে যজ্ঞস্থলে প্রতিগমন কর। তোমাদের গৃহমেধী পতিগণ সস্ত্রীক আপনাদের যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন।

তোমরা গর্গাদি প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছ, আমিই পরমাত্মা। আমি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদাই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছি। যদি বল, তাহা হইলেও সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পরমাত্মা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে গৃহে যাইব, তাহার উত্তর, "তোমাদের পতিগণ যজ্ঞ সমাপন করিবে।" তোমরা না গেলে তাহাদের কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবে না। যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদরূপে আমিই বিধান করিয়াছি, আমার আজ্ঞা-অনুরোধেই গমন কর। ধ্যানযোগেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত মূর্ত্তিতে আমাকে দেখিতে পাইবে। শ্রীভগবৎ-আজ্ঞাই যজ্ঞপত্নীগণের বহির্মুখ পতিগণের নিকট গমনের কারণ হইয়াছিল।

যজ্ঞ-পত্নীগণ বলিলেন, হে বিভো! আপনার এইরূপ পরুষ-বাক্য প্রয়োগ উচিত নহে। "আমার ভক্তের বিনাশ নাই" আপনার এই প্রতিজ্ঞা সত্য করুন। আমরা বন্ধুবর্গের তিরস্কার উপেক্ষা করিয়া আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে উপনীত হইয়াছি।

আপনার অবজ্ঞাতে ও প্রদত্ত পাদমূলের তুলসীদাম বহুমান পূর্ব্বক মস্তকে বহন করিবার জন্যই আমরা আসিয়াছি।

রাসারম্ভে মহাপ্রেমবতী গোপিকাগণের মত যজ্ঞ-পত্নীগণ বলিলেন, আপনি আমাদের বাহির ও অন্তর সকলই জানেন, সর্ব্বজন-বিদিত কৃপা-কোমল-চিত্ত ভবাদৃশ জনের এইরূপ নিদারুণ বাক্য বলা উচিত নহে। আপনি রসার্ণব সমুদ্ভূত চন্দ্র। আপনার এই প্রকার নীরস বাক্য-প্রয়োগ যোগ্য হয়না। আপনার বাক্য কেবল নিদারুণ নহে, মিথ্যাও হইতেছে।

ভগবন্! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যে ভক্ত যে ভাবে আমাকে ভজন করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি।" আপনার এই মহাবাক্য সত্য করুন। আপনি বলিতে পারেন, বিপ্রজাতীয় অভিমান জুগুপ্স। আমরা মাত্র আপনার প্রেয়সী-গোপীগণের দাসত্ব পাইলেই কৃতার্থা হইব। বিপ্রজাতীয় অভিমান হৃদয়ে থাকিলে আমরা কখনই এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারিতাম না। আপনি নিশ্চিত-রূপে অবগত হউন, আমাদের কখনই জাতিগত অভিমান নাই। আপনি মনে করিতে পারেন, "আমি গোপ, গোপ জাতীয় (গোপী) প্রেয়সীই সমুচিত। আমার বহু কোটী গোপী প্রেয়সী আছে,

"গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার।"

যদি বলেন, "আমি যদি ব্রাহ্মণীকে দাসী করি, তবে বন্ধুগণ-দ্বারা লজ্জা পাইব।" তদুত্তরে বলিতেছি, আমরা আপনার গৃহে যাইব না। এই বৃন্দাবনে বনদেবতার মত অবস্থান করিব। আপনার সম্বন্ধের গন্ধেই কৃতার্থ হইব। দূরে থাকিয়া আপনার পাদপদ্ম হইতে চ্যুত অথবা আপনার আলিঙ্গিতা প্রেয়সীর পদ সংসর্গে ত্রুটিত পর্য্যঙ্কের অধোদেশস্থ তুলসীদাম দাসীগণ প্রদান করিলে বহুমান করিয়া কেশে ধারণ করিব। আপনার প্রেয়সীকাস, এমন কি

দাসীভাবও অতিশয় দুর্ল্লভ। কাঙ্গালিনী আমাদের সেই দুর্ল্লভ বস্তু আকাঙ্ক্ষিত নহে।

যখন পতি, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও সুহৃদ কেহই আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না, তখন অন্য লোকের কথা আর কি বলিব? আমরা আপনার চরণাগ্রে পতিত হইলাম, আমাদের অন্য গতি নাই। হে অরিন্দম, আমাদিগকে দাসীত্বে গ্রহণ করুণ।

হে কৃষ্ণ, আপনার নগরস্থ মালিক-মহিলা দ্বারা যদবধি আপনার তাম্বুলাদি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সেই বনিতাগণের মুখে আপনার রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যাদি কুমারী-অবস্থায় শ্রবণ করিয়াছি, তদবধি আমরা আপনার প্রতি ভাববতী হইয়াছি। গৃহকর্ম্মাদিতে উদাসীনা আমাদিগকে ব্যভিচারিণীর মত দৃষ্টি করিয়া সন্দিহান পতিগণ পত্নীবৎ ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনি বলিতে পারেন, পূর্ব্বে আমরা সুতের কথা বলিয়াছি, তাহারা আমাদের গর্ভসম্ভূত নহে। কেহবা সপত্নী-পুত্র, কেহ প্রতিবাসিনী রমণীর পুত্র। অতএব অতি ব্যগ্রতার সহিত রোদন করিয়া আপনার পদাগ্রে মস্তক দ্বারা প্রণিপাত পূর্ব্বক গদ্‌গদবাক্যে প্রার্থনা জানাইতেছি, আমাদের অন্য গতি যাহাতে না হয়, সেই ব্যবস্থা করেন। হে শত্রু-নিসূদন, আপনার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক দুরিতাদি কৃপা বিতরণে দমন করুন। আপনার একান্ত আশ্রিত পতিত অনন্য-গতি আমাদিগকে পদে ঠেলিবেন না। আমরা স্বর্গাদি চাইনা, আপনার শ্রীচরণ-দাস্যই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা এবং সুতাদি তোমাদের চরিত্রে দোষারোপ করিবেনা। আমা কর্ত্তৃক ভক্তরূপে অঙ্গীকৃতা তোমাদিকে লোকেও কিছু বলিবে না। যজ্ঞে সমাগত দেববৃন্দও তোমাদের নির্দ্দোষিতার অনুমোদন করিতেছেন।

আমাতে পরম-প্রেমবতী সৎকুলপরা তোমাদের আমার অনভিপ্রেত নিবেদনের হঠকারিতা উচিত নহে, তোমরা গৃহে গমন কর। যদি বল, হে অভিজ্ঞ শিরোমণি, অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবতী রমণী আমরা পতি প্রভৃতির বচন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তৃণের মত পরিত্যাগ করিয়া অনেক দুরধিত জনে লম্পট নামে প্রসিদ্ধ তোমার সমীপে আসিয়াছি, আমরা পুনরায় গৃহে গমন

করিলে পতিগণ আমাদিগকে গৃহেতে প্রবেশ করিতে দিবে না, রাগান্বিত হইয়া আমাদিগকে বধ করিতে চেষ্টা করিবে, এইরূপ বলিও না। তোমাদের পতি প্রভৃতি স্বজনগণ কখনই দোষ দৃষ্টি করিবে না। তোমরা কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কাই করিওনা। আমাদ্বারা ভক্তরূপে অঙ্গীকৃত তোমাদের প্রতি পতি প্রভৃতি কেহই মন্দভাব পোষণ করিবে না। আমি ঈশ্বর, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইয়াছেন। দেবগণও যজ্ঞ-কর্ম্মে দর্শনদানে জিজ্ঞাসিত হইয়া তোমাদের নির্দ্দোষিতার সাক্ষ্য দিবেন। আমি সর্ব্বেশ্বর, এজন্য জ্ঞানবান্ দেবগণও তোমাদিগকে গ্রহণের অবশ্যই অনুমতি করিবেন।

হে অবলাগণ, কেবল অঙ্গসঙ্গ মানবগণের অনুরাগ-বৃদ্ধির হেতু নহে। আমাতে মনোনিবেশ কর, অচির কালের মধ্যেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্ত্তনে আমাতে যেমন ভাব জন্মিতে পারে, নিকটে থাকিলে তেমন হয় না, অতএব তোমরা গৃহে গমন কর।

তোমরা গৃহে গমন করিলে অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। আমার বিরহোৎকণ্ঠা অতিশয় অনুরাগ-বর্দ্ধক।

এই ব্রাহ্মণ-জন্মে দাস্যময় অঙ্গসঙ্গ লোকেও প্রশংসনীয় নহে। তোমরা অনুরাগের সহিত আমার প্রতি মনঃসংযোগ কর, অচিরে দেহান্তে আমাকে পাইবে।

(শুকদেব বলিলেন), বিপ্রপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিতা হইয়া পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। পতিগণও তাঁহাদের প্রতি দোষ-দৃষ্টি না করিয়া পত্নীগণের সঙ্গে যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

বিপ্রপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া গৃহে গিয়াছিলেন, রাসারম্ভে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিয়া রাসমণ্ডলীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। এই দুই স্থলেই কাহারও কোন প্রকারেই প্রেমের হানি হয় নাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবৎ-আজ্ঞা প্রতিপালনে বিপ্র-পত্নীগণের সাদৃশ্য বিশেষই সূচিত হইয়াছে।

অনৈকা ব্রাহ্মণী যজ্ঞস্থল হইতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যাইবার কালে স্বামী-কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক ধৃতা হইয়া গৃহে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন। তিনি যথাশ্রুত ভগবদ্রূপ ধ্যানযোগে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ম্মানুবন্ধী দেহ পরিত্যাগ করিলেন। চেতন

ময় দেহে ধ্যানযোগে শ্রীভগবানে সঙ্গতা হইলেন। এদিকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ যজ্ঞ-পত্নীগণের আনীত সেই পবিত্র সুমধুর চতুর্ব্বিধ অন্নের দ্বারা গোপ-বালকগণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ও ভোজন করিলেন।

যজ্ঞস্থলে সকলের পশ্চাৎবর্ত্তিনী অনৈকা রমণী স্বামীদ্বারা বিশেষ বলপূর্ব্বক ধৃত হওয়ায় কর্ম্মানুবন্ধন দেহ (প্রেমানুবন্ধন দেহ নহে) পরিত্যাগ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণী তৎকালে মহা-বিরহোৎকণ্ঠায় প্রবুদ্ধ মনোরথে উদ্ভাবিত শ্রীভগবৎ-স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তিতে সেই চিন্ময় দেহেই সর্ব্বজনের অলক্ষিতে শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন। মমতাস্পদ পত্যাদি-পরিত্যাগে বৈচিত্র্য কি, অহন্তাস্পদ দেহও পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ আপন প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিসার করিয়াছেন। প্রেমের প্রভাব জ্ঞাপনার্থ শ্রীভগবৎ-কৃপা তাঁহাদের অভিসার-সময়ে কর্ম্মানুবন্ধন দেহ পরিত্যাগ করাইয়া প্রেমানুবন্ধন চিন্ময়দেহ গ্রহণ করাইয়াছিলেন।

অন্যান্য দ্বিজপত্নীগণের কর্ম্মানুবন্ধন-দেহ স্পর্শমণি ন্যায়ে প্রেমানুবন্ধন চিন্ময় হইয়াছিল। স্পর্শমণির স্পর্শ প্রাপ্ত হইলে লৌহ যেমন স্বর্ণ হইয়া যায়, তাঁহাদের কর্ম্মানুবন্ধন দেহেরও তেমনই নিত্যশুদ্ধ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। সেই দিন হইতে তাঁহাদের আর পতির সঙ্গে কোন মায়িক সম্পর্কই ছিলনা। শ্রীভগবৎ-কৃপার অসম্ভব কিছুই নাই। দ্বিজ-পত্নীগণের ভক্তি-উৎকর্ষের তারতম্য ভক্তি-শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবৎ-কৃপাসিদ্ধা। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যজ্ঞপত্নী, বৈরোচনি (বলি) শুকদেব প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধ।

গোপগণের অপেক্ষা অন্নের অল্পত্ব বোধিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই অল্প অন্নদ্বারাই সকলের উদর পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রভু অর্থাৎ সর্ব্ব-সমর্থ, সখিগণকে ভোজন করাইয়া অনিচ্ছাসত্বেও শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিলেন। অনিচ্ছার কারণ প্রেমবতী দ্বিজপত্নীগণের সঙ্গম ভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ অনুতাপের উদয় হইয়াছিল।

"ভগবানপি" অপি শব্দে শ্রীভগবানও সেই নিরুদ্ধা রমণীর সর্ব্বেন্দ্রিয় (চিন্ময়-দেহ) সকলের অলক্ষিতে গ্রহণ করিয়া গোবিন্দ-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। নিরুদ্ধা রমণী পতি সম্বন্ধি দেহ পতিকে প্রদান করিয়া শ্রীভগবৎ-প্রেম-সিদ্ধ-দেহে গোকুলের প্রকাশ বিশেষ গোলোকধামে-

(অপ্রকট-প্রকাশে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যিনি যাহা ভাবিয়া দেহ-ত্যাগ করেন, অথবা যিনি যে ভাবে আমাকে ভজনা করেন, ইত্যাদি গীতা বাক্যের এখানে সফলতা দৃষ্ট হয়। পূতনা-মোক্ষে এই বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণকে স্বয়ং অন্ন পরিবেশন করায় গোপগণের প্রতি তাদৃশ অসীম অনুগ্রহ দর্শনে মুনীন্দ্র শুকদেব গোস্বামীরও চমৎকারাতিশয্য দৃষ্ট হইয়েছে। প্রভু শব্দে নিরর্গল অনুগ্রহ ধ্বনি পাওয়া যাইতেছে।

এই প্রকারে লীলাময় নরবপু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরবপু—নরবপুই ভগবৎ স্বরূপ; নরাকার পরব্রহ্ম ইহাই শাস্ত্র বাক্য,

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকৈশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতি।"

"গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্"

নানাবিধ লীলা-দ্বারা মনুষ্যলোকে নিজ ভক্তি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য মানব ব্যবহারের অনুকরণ করতঃ নিরুপম সৌন্দর্য্য, মধুর বাক্য এবং অলৌকিক চরিত্র দ্বারা গো-গোপ এবং গোপীগণের চিত্ত বিনোদন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ-পত্নীগণকে রমণ করেন নাই, কিন্তু গোপপত্নীগণকে রমণ করিয়াছেন। সর্ব্ব সত্য-সঙ্কল্পতাদি শক্তি-পূর্ণ শ্রীভগবানের ব্রাহ্মণীজন-রমণে লীলা-সৌষ্ঠবের অভাব, এখানে এই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। বৎসলা গোপীগণের প্রাসঙ্গিকত্বে এখানে যুবতী মাত্রকে এই ধ্বনি পাওয়া যায়। রাস-লীলার পূর্ব্বে ব্রজদেবীগণের সঙ্গে রমণ হয় নাই, এমন নহে। অন্যান্য বহুবিধ লীলা শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেন নাই, এখানে এই ভাব সূচিত হইয়াছে। যজ্ঞ-পত্নী-অনুগ্রহাদি শ্রীকৃষ্ণের অখিল চেষ্টা ও সৌন্দর্য্যাদি শ্রীব্রজজনের প্রমোদ পরিবর্দ্ধনার্থই হইয়াছিল।

অনন্তর সেই সমস্ত (যাজ্ঞিক) ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে অপরাধী মনে

করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন ভাবিলেন, হায়! বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা হত হইলাম। তাঁহার প্রার্থনা কেবল আমাদের বিড়ম্বনার (উপহাসের)ই কারণ। অভাগা আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণগণের এই অনুতাপ ভক্তিমতী পত্নীগণের দর্শনের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল। তাদৃশ শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-লব্ধ-পত্নীগণের সঙ্গ-প্রভাবে পতিগণের সৎ-বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। পতিগণ পত্নীগণের প্রতি দোষ দৃষ্টি করিলেন না। দুরভিমানগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণ বিবিধ প্রকারে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ভক্তি-উদয়ে বিদূরীত-অভিমান ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত হইলেন।

ভার্য্যাগণের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অলৌকিকী ভক্তি-দর্শনে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-বিহীন অনুভব করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বিশেষ ভাবে আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বলিলেন, শৌক্র, (ব্রাহ্মণৌরসে জন্ম) সাবিত্র (বেদ-দীক্ষা) এবং দৈক্ষ (গায়ত্রী-দীক্ষা) আমাদের এই ত্রিগুণিত জন্মকেই ধিক্। ব্রহ্মচর্য্যকেও ধিক্। বহুজ্ঞতাকেও ধিক্। কুলকেও ধিক্, আমাদের বংশ-পরম্পরা দীক্ষাকেও ধিক্, কারণ আমরা ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীভগবানে বিমুখ। এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, শ্রীভগবানের মায়া অষ্টাঙ্গ-যোগিগণেরও মোহজনিকা, কর্ম্মশীল আমাদের কথা কি? নতুবা আমরা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও সকল বর্ণের গুরু হইয়াও (বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ) আপন হিত-বিষয়ে মুগ্ধ হইব কেন?

স্বামিপাদ লিখিতেছেন, শ্রীভগবানে বৈমুখ্য উত্তম-জন্মাদি সমস্তকেই একান্ত নিরর্থক করে। গীতা বলেন, "কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা" "ভক্তই ভক্তিলাভে উপযুক্ততম।"

সাবিত্রী-শব্দে এখানে গায়ত্রী-জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গায়ত্রী ব্রহ্মাভিধায়ক। লীলা-প্রকাশক ভাগবতগ্রন্থ গায়ত্রীরও অর্থ-প্রকাশক। গায়ত্রীর শ্রীভগবৎ-পরতা অগ্নিপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

অত উপাসনা-ময়ী দীক্ষাকেই নিন্দা করিয়াছেন,—বিষ্ণুদীক্ষাকে [illegible]। গীতায়ও বলিয়াছেন,

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, অহো! মায়া-মোহিত আমাদের কি দারুণ কষ্ট। কর্ম্মী জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে যোগী বলিয়া অভিমান করিতেন। তাঁহাদিগকে (কর্ম্মী জ্ঞানীও যোগী প্রভৃতিকে) লক্ষ্য করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহাশয় "বালিশা বৃদ্ধমানিন" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। "হে দ্বিজা" শব্দে অনুতপ্ত ভাবে একে অপরকে সম্বোধন বলিয়াছেন—

"অহো, জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণে নারীগণেরও কি অনুপম ভাব অবলোকন কর। এইরূপ ভাবেই গৃহসংজ্ঞক মৃত্যু-পাশ সংছিন্ন হয়।"

ব্রাহ্মণগণ পত্নীগণ হইতেও আপনাদিগকে নিকৃষ্ট মনে করিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। আমরা এই ভক্তিমতী স্ত্রীগণের পতি—এই ভাব আমাদের উচিত নহে। আমরা স্ত্রীগণের গুরু হইলেও আমাদের গুরু-বুদ্ধি নিতান্ত অসঙ্গত।

ব্রাহ্মণীগণের পতিগণ এবং গুরুগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণে পরমাপেক্ষা সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ জগৎগুরু। অনেক হতভাগ্য গুরুভক্তি প্রকাশের ছলে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন। তাঁহাদের বুঝা উচিত, শ্রীকৃষ্ণ গুরুরও গুরু। শ্রীকৃষ্ণ গুরু হইতে ছোটি তত্ত্ব নহে, যে গুরুভক্তির উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিতে হইবে না। আরও এক কথা—যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি নাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার বিদ্বেষভাব তিনি গুরুই হইতে পারেন না। গুরু তিনিই, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ দর্শন করাইয়া দেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির বিরোধী, তিনি কখনই গুরুপদবাচ্য নহেন। সদাচার-বিহীন ব্যক্তি গুরু-যোগ্য নহেন। মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন। তাঁহাকে (গুরুস্থানীয় ভারতীকে) প্রণামও করেন নাই, মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,

"ভারতী গোঁসাঞি কেন পরিবেন চাম"।

ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর কথায় লজ্জিত হইলেন। চর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন।

শ্রীগুরু-ভক্তির প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করিবে, এমন নহে। শ্রীগুরুকে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি দশপ্রকার নামাপরাধের একটি অপরাধ। আগে গুরুভক্তি, পরে কৃষ্ণ-ভক্তি। শ্রীগুরু-চরণে যাঁহার রতি নাই, জগতে তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগা কে? ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন,

শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই যে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥

হায়, শ্রীগুরো! পতিত-পাবন "শিরোমণি" প্রভু এই নিতান্ত পতিত ভক্তি-বিহীন নরপশুকে দয়া কর। প্রভু সর্ব্বগুণাধার, করুণা-রসের পারাবার, এই দীনহীন অভাগার প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত কর। গুরো, তোমার শ্রীচরণাম্বিকে দীনহীনকে টানিয়া লও। আমি যেন নিরবধি সিদ্ধদেহে তোমার মঞ্জরী-স্বরূপের চিন্তা করিতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ কর।

ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন, প্রেমের মহান্ প্রভাবে আমাদের পত্নীগণ সদ্যই কৃতার্থা হইয়াছেন। অন্যান্য সাধনে মৃত্যুর পর ফল-প্রাপ্তি। ভক্তিতে কিন্তু তৎক্ষণাৎ কৃতার্থতা। আমাদের ভার্য্যাগণের গৃহ, পতি ও অপত্যাদির আসক্তি সদ্যই সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত হইয়াছে।

হায়! যাঁহাদের পতি শ্বশুরাদিরূপে আমরা তাঁহাদের গুরু, সেই সমস্ত রমণী কৃতার্থা, আর আমরা গৃহান্ধকূপে পতিত। হায়! আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? নারীগণের, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই ভাবটী দুর্গম অর্থাৎ আমরা এই ভাবের পরিমাণ করিতে পারি না। হা প্রাণরমণ কৃষ্ণ ইত্যাদি, গদ্গদাক্ষর বচন কম্পাশ্রু-পুলক-বৈবর্ণ্যাদি অনুভাব দ্বারা পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণে কি অপূর্ব্ব প্রেম-ভাব বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। অদ্য হইতে পত্নীগণ আমাদের গুরু। শ্রীকৃষ্ণানু-রাগিণী রমণী-শিরোমণি পত্নীগণ পরম আদরণীয়া। ইহাদের প্রতি মনে মনেও ভার্য্যাবুদ্ধি কখনই উচিত নহে।

কি আশ্চর্য্য! এই সকল অবলাগণের উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই। গুরু-গৃহে বাস করিয়া, ইঁহারা ব্রহ্মচর্য্যও পালন করে নাই, ইঁহারা তপস্যা, বানপ্রস্থ ধর্ম আচরণ আত্ম-তত্ত্বের বিচার করে নাই। শৌচ এবং সন্ধ্যোপাস-নাদি শুভ ক্রিয়াও ইঁহাদের দৃষ্ট হয় না। তথাপি যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর উত্তম-শ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ইহাঁদের দৃঢ়া ভক্তি জন্মিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার সংস্কারাদি-বিশিষ্ট আমাদের লেশ মাত্র ভক্তিও জন্মে নাই। নিশ্চয়রূপে বুঝিলাম, স্বার্থ-বিমূঢ় গৃহমেধী আমরা একান্ত উন্মত্ত হইয়াছি। কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বাক্য দ্বারা আমাদিগকে সদ্গতির কথা স্মরণ করাইয়াছিলেন। অহো! না হইলে মোক্ষাদি চতুর্ব্বিধ-পুরুষার্থের আশ্রয় পূর্ণকাম সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-

বানের, অধীনস্থ আমাদের নিকট অন্নভিক্ষার প্রয়োজন কি ? ইহা—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আমাদের মত কর্ম্ম-যোগীর মাত্র উপহাসের বিষয় হইয়াছে।

আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, শ্রীভগবৎ-ভক্তিই মায়া-তরণের প্রকৃত উপায়, ব্রাহ্মণাদি সৎজন্মের দ্বারা কৃতার্থ হওয়া যায় না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

"এব" শব্দে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই মায়া-তরণের উপায় ধ্বনিত হইতেছে। অন্য দেব-উপাসনায় কিম্বা কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধনায় মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ দোষে মায়া হইতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়া মুক্ত হয়॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়"॥

"উত্তম-শ্লোক" শব্দে বৈরীগণেও মোক্ষাদি-দানে পরম সুখ্যাতিশালী। "যোগেশ্বরেশ্বরে" শব্দে ভক্তি-যোগিগণের ঈশ্বর, যাঁহাকে সেবা করিলে দৃঢ়াভক্তি লাভ হয়। হায়! আমরা কর্ম্মযোগী তাঁহার তত্ত্ব বুঝি নাই। বুঝিলাম, দ্বিজাতি-সংস্কারাদি স্বয়ং ভক্তির কারণ নহে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলাদি বর্ণনা-তৎপর ব্রজস্থ মালিকাদি বনিতা-জনের সঙ্গ-গুণেই পত্নীগণের ভক্তি লাভ হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ ইহা বুঝিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণগণ কাতর প্রাণে বলিতে লাগিলেন, শ্রীভগবানের অসাধারণ কৃপা-মাহাত্ম্য কি মধুর, আর আমাদের তৎবিমুখতা কি ঘৃণা।

হায়! নিরুপাধি কারুণ্য ব্যতীত পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণের আমাদের নিকট অন্ন-প্রার্থনার অন্য অর্থ কি থাকিতে পারে ? এই অন্নপ্রার্থনা নিশ্চয়ই লোকের কারণ হইলেও আমাদের প্রতি কৃপা-প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তাহা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমরা কর্ম্ম-যোগীর [illegible] প্রার্থনা ছলে [illegible] হইয়াছে।

[illegible]! অতএব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আমি আপনার চাঞ্চল্য ও পূর্ব্বস্থিতি পরিহার পূর্ব্বক [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] করেন,

তাঁহার যাচ্ঞা (অন্ন প্রার্থনা) নিশ্চয়ই জনমোহিনী। দেশ, কাল, চরুপুরোডাশাদি বিবিধ দ্রব্য, মন্ত্র, প্রয়োগ, ঋত্বিক, (পুরোহিতাদি) অগ্নি, দেবতা, যজমান্, যজ্ঞ এবং ধর্ম্ম, এই সমস্ত যাঁহার বিভূতি স্বরূপ, অর্থাৎ যাঁহার উদ্দেশে এই সব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তিনি কৃপা-পরবশ হইয়াই অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

যদি বল, তিনি যদি স্মরণই করাইলেন, তবে তোমরা কেন স্মরণ করিলে না? ইহার কারণ, আমরা মোহিত। শ্রীভগবানের অন্ন প্রার্থনা, অস্মদ্বিধ জীবগণের মোহিনী। ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) ঈশ্বর নহেন, এই মোহ-উৎপাদনকারিণী। ক্ষীরোদ-মন্থনের পর লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর-লীলায় অনুকরণ সৃষ্টি করিয়া লক্ষ্মীর কথা বলিয়াছেন। তিনি নিজ ভক্তগণের সুখ-বিধানার্থই এই সব লীলা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী চাঞ্চল্যাদি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার পাদপদ্মসেবা করেন, তিনি কি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিলেন? কখনই নহে। পূর্ণকাম হইয়া গোচারণাদি ও তাঁহার এই সমস্ত লীলা করুণারসের খেলা মাত্র।

হায়! সেই যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বত্র শ্রবণ করিয়াও মূর্খ আমরা কোনই অনুসন্ধান করি নাই। এক্ষণে অকুণ্ঠ-মেধা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি,— যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা কর্ম্মমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছি। সেই আদ্য পুরুষ আমাদিগকে ক্ষমা করিতে যোগ্য হন। তাঁহার মায়াতে মোহিত-চিত্ত হইয়াই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি নাই।

যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণগণ অপরাধ হেতু পরম দৈন্যের সহিত অতি ব্যগ্রভাবে বারবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। আপনাদিগের মূঢ়ত্ব এবং মূঢ়তার কারণ তাঁহার দুরতিক্রম্যা মায়া—ইহা অনুভব করিলেন। এক্ষণে মায়াপগমে ভক্তির সহিত শ্রীভগবৎ চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মমার্গকে জলাবর্ত্তের মত মনে করিলেন। জল ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইলে যেমন বিনির্গত হইতে পারে না, কর্ম্মমার্গে অভিনিবেশ থাকিলেও তেমনই বাহির হওয়া যায় না। কর্ম্মের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকায় যদিও আমরা অপরাধী, তথাপি তাঁহার অংশ সহস্র-শীর্ষা পুরুষকে সূত্রবৃত্তি উৎপন্ন বলিয়া

আমরা ক্ষমার যোগ্য। পিতা যেমন অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করেন, তিনিও আমাদিগকে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট আমরা অবশ্যই তৎকৃপার উপযুক্ত। তাঁহার অংশ পরমাত্মা আমাদের দেহাভ্যন্তরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি পরমাত্মারও অন্তর্য্যামী এবং নিয়ন্তা। তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়ম্য আমরা এই ভীষণ অপরাধ করিয়াছি। তিনি পুরুষোত্তম। দীন-বাৎসল্য এবং ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়াও আপন স্বাভাবিক-গুণে তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি সদয় হইবেন।

বিপ্রগণ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলন জন্য অপরাধ স্মরণ করিয়া যদিও রাম ও কৃষ্ণকে দর্শনের অভিলাষী হইলেন, তথাপি কংসের ভয়ে ভীত হইয়া তথায় গমন করিলেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান-পরায়ণ হইয়া গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের এবং অপরাধ-ক্ষমাপনের জন্য একটী পদও অগ্রসর হইলেন না। কংস-ভয়ে একান্ত ভীত হইয়াই বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও গমন করিলেন না। শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, উৎপত্তির অভাবেই তাঁহারা আপনাদের অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

হায়! আমরা সামান্য ভৃত্যকে যতটুকু বিশ্বাস করি, শ্রীভগবানে তাহার বিন্দুমাত্রও করি না। রাত্রিকালে কোথাও যাইতে হইলে ভৃত্য আগে আলো লইয়া যায়, পশ্চাতে আমরা গমন করি। হঠাৎ ঝড় আসিয়া যদি আলো নিবিয়া যায়, কিম্বা ব্যাঘ্র আসিয়া আক্রমণ করে, তবে ভৃত্য তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। তখন নিঃসহায় অবস্থায় বাধ্য হইয়া আমরা শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করি। যতক্ষণ উপায় থাকে, ততক্ষণ ভগবানকে ভাবি না। যখন একান্ত অসহায় হই, তখনই তাঁহার প্রতি ভক্তি করিবার ইচ্ছা হয়। আমরা সর্ব্বদা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, শ্রীভগবান্ শরণাগতের চির রক্ষক। কিন্তু এত হইয়াও আমাদের বিশ্বাস হয় না, হায়! কি পরম দুর্ভাগ্য!

দ্রৌপদী একান্ত অসহায় অবস্থায় যখন শ্রীভগবানকে আর্ত্তভাবে ডাকিয়াছিলেন, উত্তরা গর্ভরক্ষার্থ যখন কাতর প্রাণে শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন কি শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন নাই? হিরণ্য-কশিপু যখন পুত্র প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বিষ খাইতে

দিয়াছিলেন, হস্তীর পদতলে ফেলিয়াছিলেন তখন কি শ্রীভগবান তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন নাই? বিপন্ন গজকে কুম্ভীরের হস্ত হইতে তিনিই ত রক্ষা করিয়াছিলেন। হায়! এত দেখিয়া শুনিয়াও আমরা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগত হইলাম না। শরণাগতি ভক্তির একটী উচ্চতম অঙ্গ। সহজে এইটী ভাগ্যে ঘটে না। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণই শরণাগতির লক্ষণ—

"শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥"

দ্রৌপদীর ভক্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়েনাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনং॥"

আমি দূরবর্ত্তী থাকাতে দ্রৌপদী যে হে "গোবিন্দ" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এই ঋণ আমার হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা কোন ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে না।

ভক্তির ফলে শ্রীভগবানের বশ্যতা বড়ই মধুর। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদিতে এই প্রকার মধুরতা নাই।

ব্রাহ্মণগণ ভাবিতে লাগিলেন, এখনও কি শ্রীকৃষ্ণ যমুনার উপকূলে অশোক-বনে রহিয়াছেন, অথবা ব্রজে চলিয়া গিয়াছেন? শোক ও অনুতাপাদিতে হৃদয় আক্রান্ত বলিয়া সেই সময় ব্রাহ্মণগণ অশোক-বনে গমন করিলেন না। তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। সায়াহ্নকালে ঐক্যমতের অভাবে তাঁহাদের ব্রজে যাওয়া হইল না। সকলের মনেই সহসা কংসের ভয় উদিত হইল। কংস যদি আমাদের ব্রজ-গমনের সম্বাদ প্রাপ্ত হয়, তবে জীবিকা বন্ধ করিয়া দিবে। ব্রাহ্মণগণ ভয়ে একান্ত ব্যাকুল হইলেন। ব্রাহ্মণীগণ কিন্তু পতিগণের দ্বারা ত্যাগ এমন কি বধের ভয়ও করেন নাই। প্রেমই ইহার হেতু। ব্রাহ্মণগণের মনঃকল্পিত ভয়ের আভাসই কৃষ্ণ-দর্শনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। শ্রীভগবানের মায়াই ইহার মূল কারণ। *

* "যজ্ঞ-পত্নীর মুক্তিকথা" মূল সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ করা হইয়াছে

কর্ম্ম ও যোগাদিতে ব্রাহ্মণগণ কৃতার্থ হইতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণীগণ ভক্তির ফলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে কৃতার্থ হইলেন। এই জন্যই শাস্ত্র ভক্তিযোগের অশেষ মাহাত্ম্য প্রকটন করিয়াছেন।

বাস্তবিক অনায়াসে অতি অল্পকালের মধ্যে শ্রীভগবৎ-লাভ একমাত্র ভক্তি-দ্বারাই হইয়া থাকে। এমন সহজ, এমন সরল উপায় আর নাই। গোস্বামি-গ্রন্থ বিশেষ বিচার করিয়া ভক্তি-যোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের এত অল্পে পরিতুষ্টি অন্য সাধনে দেখা যায়না। এক গণ্ডূষ জল বা একটী মাত্র তুলসী-পত্র শ্রীভগবৎ চরণে অর্পিত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মবিক্রয় করিয়া ভক্তের ঋণ পরিশোধ করেন,

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলকেন বা।
বিক্রীণিতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যোঃ ভক্তবৎসলঃ ॥

একবার মাত্র তাঁহার নাম গ্রহণ করিলে চণ্ডাল ব্যক্তিও ভুবন-পাবন হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ-নাম-মাহাত্ম্যে আনন্দে অধীর হইয়া দিগম্বর উমা-পতি শঙ্কর নিরন্তর নৃত্য করেন। অনন্ত বদনে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণ নাম গানে সর্ব্বদা বিভোর,

"সহস্র বদনে কৃষ্ণ-যশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদি দেব মহীধর॥"

ভক্তি-বলে বলিয়ান্ অনন্তদেব ভক্তি-সিন্ধুর পরপারে গমন করিতে যতই অগ্রসর হন, শ্রীকৃষ্ণের যশসিন্ধু ততই বিস্তৃত হয়। অনন্তদেব কূল প্রাপ্ত না হইয়া সেই অপার অনন্ত ভক্তি সিন্ধুর মধুর তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ান,

"নাগ বলি যায় বেগে সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাড়ে॥"

ফলতঃ যাঁহারা ভগবৎ-গুণ-কীর্ত্তনে বিভোর, তাঁহাদের আর সাধ মিটেনা। যতই তাঁহারা ভক্তি-পথে অগ্রসর হন, ততই আপনাদিগকে অকৃতার্থ বলিয়া বোধ করেন। কেবল আমার মতন একান্ত নির্ব্বোধগণই ভক্তি-পথের বাতাস না লাগাতে অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হন! হায়! অভিমানী আমার কি উপায় হইবে? অভিমানী ব্যক্তির সবই বিফল হইয়া থাকে,

"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন
বৃথা তার অশেষ ভাবনা।"

হায়রে! কামাদি রিপুর জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া কতই ত সেবা করিলাম, তাঁহাদের দুষ্ট আদেশ প্রতিপালন করিয়াই ত কেবল কাল কাটাইলাম। কামিনীর ক্রীড়া-মৃগ হইলাম। হায়রে, হায়! কামাদি রিপুগণের অশেষ সেবার ফলেও ত তাঁহারা এখনও আমাকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিলেন না। জীবন-সন্ধ্যায় ভাবিয়া হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে। হায়রে! আর ত সময় নাই। পশ্চিমগগনে ঐ ত রবি অস্ত যাইতেছেন, আমার জীবন-রবিরও ত এখন অস্ত যাইবার সময় সন্নিকটবর্ত্তী। ভবনদীর পরপারে কি করিয়া গমন করিব? ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া যে কেবল প্রাণ কাঁপিতেছে। দেহতরী যে জীর্ণ শীর্ণ। কাণ্ডারী সে তরীতে নাই। হায়রে, আমার তরিবার উপায় কি? হায়, হায়! এই ভীষণ দুর্দ্দিনে যাঁহাদিগকে আমি আপন বলিয়া আসিয়াছি, তাঁহারা কেহই আমার কোন প্রকারই সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাঁদিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যে কোনই সাধ্য নাই। হায়রে! কামিনী-কাঞ্চনের মোহ! এমন মোহিনী আর ত দ্বিতীয় নাই। হায়রে, আশা-বৈতরণী, সকলের নিবৃত্তি আছে, কিন্তু তোমার নিবৃত্তি নাই। কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে ছাই হয়, কিন্তু আশা কিছুতেই নষ্ট হয়না। আশা-কানন কি সুন্দর, কি অপূর্ব্ব, কি মনোহর! প্রাণে কতই না বাসনা জাগিতেছে। কিন্তু পূর্ণ হইতেছেনা, কেবল নিত্য নবীন বাসনা গজাইতেছে। হায়! হতভাগ্য আমার উপায় কি, ভাবিয়া পাইতেছিনা।

পুত্র-স্নেহে যতটা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ঘটে, মানবদেহে তেমন নহে। ইন্দ্রিয়-তর্পণ পশ্বাদি-জীবনে অধিক মাত্রে হইয়া থাকে। আর ত কতবার পশু-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিব, ইন্দ্রিয়-তর্পণে অধিকতর সুযোগ পাইব, কিন্তু হায়রে! আর ত ভজন করিতে পারিবনা। নরদেহ ব্যতীত ভগবৎ-ভজন হয়না,

"নরতনু ভজনের মূল।"

দেবতাগণও মনুষ্য হইতে সুরদেব-সাধনের আকাঙ্ক্ষা করেন। [illegible] একটি অবতারে [illegible] নরদেহে [illegible] কথা [illegible] [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] [illegible] আপন

তনয়াকেও আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা যখন হরিদাস রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন পরমা সুন্দরী বেশ্যাগণ বিবিধ হাবভাব প্রকাশেও তাঁহাকে মোহিত করিতে পারিলেন না। এমন কি, মায়াদেবী মোহিনী-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া উপযাজিকা হইয়াও তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইলেন। শেষে মায়া আত্ম-পরিচয় দান করিয়া বলিলেন,

"আমি মায়া নারিলাম তোমারে মোহিতে।"

ভক্তের নিকট মায়া আপন ত্রিলোক-মোহিনী-মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে পারেন না, কিন্তু ভক্ত ব্যতীত অপরে তাঁহার মোহিনী-মূর্ত্তিতে বিমোহিত হইয়া থাকেন।

হায়, সুদুর্লভ মনুষ্য-দেহ ভাগ্যফলে লাভ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণভজনে বিমুখ হইলাম, কেবল কামিনীর ক্রীড়া-মৃগ হইয়া কাল কাটাইলাম, ইহাপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে?

মুখে বলিয়া বেড়াই, "দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক পলক লহু চুষে। দুনিয়াকো লোক, বাউরী হবে, ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।"

এই সমস্তই কেবল প্রতারণা। পরকে প্রতারিত করিতে যাইয়া মাত্র আত্ম-প্রতারণাই করি, ইহা বুঝিয়াও বুঝিনা। লোকের নিকট ভণ্ডামি প্রকাশ করিয়া যতই উপরে উঠি, দৃষ্টি ততই ভাগাড়ে থাকে। শকুনের মত আমার অবস্থা—উপায় দেখিনা।

বয়সে বৃদ্ধ হইলেও কিন্তু নিত্য নব নব কামনা জাগ্রত হইয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। নরকের পথে অবিরত শুধুই ছুটিতেছি। হায়রে হায়! এই মহা বিপদে উদ্ধারের ক্ষীণ আশাও ত দেখিতে পাইতেছিনা।

ভক্তিই এই বিপদ-তরণের একমাত্র সদুপায়, কিন্তু হায়, ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম কৈ? কেবল লোকের চক্ষুতে ধূলি প্রদানের চেষ্টায়ই জীবন গেল। উদ্ধারের আর কোনই উপায় দেখিতেছি না। কেবল ক্লেশে ক্লেশেই দিন যাইতেছে,

"মুক্ত দেখি সব ক্লেশ, উদ্ধারের নাহি লেশ
অনাথ কাতর হেই কান্দে।"

ভক্তির সুধা-মধুর মাধুরীতে যদি মুগ্ধ হইতাম, তবেই লোভের বশ হইতে দূরে থাকিতে পারিতাম। হায়! ভক্তিতে আগ্রহ হইল না, জীবন একাকই

বিফলে গেল। শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভজন-বিমুখ হইয়া জানিয়াও আমি অনবরত কেবল বিষয়-বিষই ভক্ষণ করিলাম, করিতেছি।

সংসার কালকূটের নিদারুণ জ্বালায় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। হায়রে! জুড়াইবার উপায় করিতেছি না। প্রেমদাতা নিতাইচাঁদের কৃপা ব্যতীত সংসার সমুদ্রের পরপারে গমন করা যায়না,

"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে?"

ঠাকুর বৃন্দাবন দাস উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়াছেন,

"সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥"

শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শুদ্ধা-ভক্তির উদয় হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় না হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা মাধুরীতে হৃদয় কখনই আকৃষ্ট হইতে পারেনা। বৈষ্ণব-কবি নিত্যানন্দ-প্রেমে বিভোর হইয়া গান করিয়াছেন,

"যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়রে যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়।
সে শরণ লউক নিতাইচাঁদের অরুণ কমল দুখানি পায়রে,
অরুণ-কমল দুখানি পায়॥
নিতাই যাহা যাহা রহিছে
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সুধানিধি মানস ভরিবে পিয়ে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনুগতি ব্যতীত ভক্তি-রসের মধুরতা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহার প্রাণ, তিনিই ব্রজ-গোপীর মধুর ভক্তি-রসটী আস্বাদন করিতে পারেন,

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা মতি না হইলে কৃতার্থ হওয়া যায় না। এই মতি লাভের একমাত্র উপায় লোভ। কোটী জন্মের সাধনায়ও এই লোভটী লাভ হয়না।

একজন নবীন যুবককে অনেক প্রাচীন সদাগর উপদেশ প্রদান করিলেন, তুমি ত বাণিজ্য করিতে যাইতেছ, যে জিনিষটী অল্পস্থানে রাখা যায়, কিন্তু বিক্রী করিলে গৃহে টাকা ধরে না, এমন বস্তুর ব্যবসা করিও। যে বস্তু রাখিতে হইলে বৃহৎ গৃহের দরকার, কিন্তু বিক্রী করিলে বাক্সও পূর্ণ হয়না, তেমন জিনিষের ব্যবসা করিও না।

নবীন যুবক বিনীত ভাবে বলিলেন, মহাশয়, আপনার কথাটী ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল না, স্পষ্ট করিয়া বলুন, প্রার্থনা।

সদাগর বলিলেন, মাটীর জিনিষের ব্যবসা করিওনা। এই জিনিষ রাখিতে অর্থব্যয় করিয়া বড় করিয়া গৃহ বাঁধিতে হয়, কিন্তু বিক্রী করিলে অতি অল্প অর্থ লাভ হয়। মতির ব্যবসা বড় উত্তম। এই ব্যবসায় বৃহৎ গৃহাদির প্রয়োজন হয়না, কিন্তু বিক্রী করিলে প্রচুর অর্থ লাভ হইয়া থাকে।

ভক্তি-জগতের নবীন সাধককে লক্ষ্য করিয়াই এই কথাটী বলা হইয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি কৃচ্ছ্র-সাধনে বহু পরিশ্রম, কিন্তু ফললাভ অত্যন্ত অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে। ভক্তি-সাধন সর্ব্বোত্তম এবং ইহা অতি সহজ-সাধ্য। ইহাতে শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি-সুখ ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন, যদি সাধন-পথে অগ্রসর হইতে চাও, তবে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরস-ভাবিত'-মতি ক্রয় কর, কৃতার্থ হইবে,

"কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতা মতি ক্রিয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্ম-কোটি--সুকৃতৈ র্ন লভ্যতে॥

হায়! কতদিনে এই মধুর ভক্তি-রস আস্বাদনের ভাগ্য হইবে, মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিকট প্রার্থনা, আপনাদের আস্বাদিত এই ভক্তিরসটী যাহাতে আস্বাদ করিতে পারি, আপনারা সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

গীতা সর্ব্ব সম্প্রদায়ের পরম মান্য গ্রন্থ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের তুর্জ্জেয়ত্ব, পরমতত্ত্ব, এবং সর্ব্বদেবতা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব, সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বও গীতা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য দেবদেবীর উপাসনা যে ভগবৎ-উপাসনা নহে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ইহাও নিজেই বলিয়াছেন, নিম্ন শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণের তুর্জ্জেয়ত্ব এবং পরম তত্ত্ব সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে,

"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥

দেবগণ এবং মহর্ষিগণ কেহই আমার বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত নহে। আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণেরও আদি কারণ।

ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদি দেবগণ আমার অসাধারণ শক্তির কথা জানেন না। আমার নাম, কর্ম্ম, স্বরূপ ও স্বভাবাদি কি দেবতা, কি মহর্ষি কেহই অবগত নহে। দেবত্ব ও ঋষিত্বাদি পুণ্য গুণ-সমূহ আমিই তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছি।

জন্মরহিত নানা বিভূতিযুক্ত আমার আবির্ভাব দেবতা ও ভৃগ্বাদি ঋষিগণের ধারণার অতীত। আমি সকলের বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, সুতরাং আমার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাকে কেহই জানিতে পারে না,

"কে মোরে জানিতে পারে যদি না জানাই।"

দেবতাগণের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া আমিই তাঁহাদিগকে ঐশ্বর্য্যাদি দান করিয়াছি। তাহাদের জ্ঞান পরিমিত, কাজেই তাহারা আমার অসীম অনন্ত মহিমা ও স্বরূপাদি অবগত নহে। আমার ঐশ্বর্য্য অনাদি সিদ্ধ অতি দুর্বিজ্ঞেয়। শ্রুতি বলেন, 'কো বা বেদ, কইহ প্রবোচৎ, কুত আয়াতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিরর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনে নাথ কো বেদ, যত আবভূবেতি নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বম-দর্শদিতি।" কেই বা জানে, কেই বা এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছে, কোথা হইতে ইহার আবির্ভাব হইল, কোথা হইতে ইহার সৃষ্টি, দেবমণ্ডলী ইঁহার দ্বারা সৃষ্ট, অতএব কে ইঁহাকে জানে। যাহা হইতে আবির্ভাব, দেবতারা তাহাকে জানেন না।

আমি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের উৎপাদকত্ব বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্ব, নিমিত্তত্ব ও উপাদানাদিত্ব প্রভৃতির আদি কারণ কাজেই দেবগণ আমার প্রভাব জানিতে পারেন না। প্রভব শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য, বিক্রমাদি সৃষ্টি-সামর্থ্য, জন্মরহিত হইয়াও অনাদি স্বরূপ গুণ বিভূতি প্রকৃষ্ট স্বরূপে আবির্ভূত প্রভুশক্তি ইত্যাদি।

পিতৃ-জন্মাদি যেমন পুত্র জানে না, (অজ) জন্মরহিত আমার আবির্ভাবও তেমনই দেবগণের অগোচর।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে,

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"

যে পরম পুরুষ প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে প্রথমে বেদ প্রদান করিয়াছেন, আমি মুক্তিকাম হইয়া আত্মজ্ঞানে প্রকাশিত সেই পরম পুরুষের শরণাগত হই। চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন, "হেন কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং'র অবতার, তাঁর কৃপা বিনা কার শক্তি জানিবার ?" গীতার নিম্ন-শ্লোকটীতেও সর্ব্বদেবগণ হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৃথকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে,

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতা॥

আমি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি-স্থান, সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ আমা হইতেই কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত। পণ্ডিতগণ এই রহস্য অবগত হইয়া প্রীতির সহিত আমার ভজনা করেন।

স্বয়ং ভগবান্ (কৃষ্ণ) আমি বিধি-রুদ্রাদি ও প্রপঞ্চাদির উৎপাদক। অথর্ব্ব বেদেও লিখিত হইয়াছে—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তিস্ম কৃষ্ণ ইতি"। অথ পুরুষোহ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েত্যুপক্রম্য নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টবসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা ইত্যাদি। এখানে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল—নারায়ণ হইতেই, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রাদি দেবতা জাত হইয়াছেন। এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

শক্তি, মহেশ্বর, সূর্য্য, গণেশ ও শ্রীকৃষ্ণ সকলে একই পরমতত্ত্ব হইলে হিন্দু-শাস্ত্রে পঞ্চোপাসনার কথা থাকিত না। শক্তির ধ্যানে মহেশ্বরের পূজা, মহেশ্বরের ধ্যানে সূর্য্যের পূজা হইত। স্থূল-বুদ্ধি অনেক জ্ঞানবান্ মহাত্মা এই সোজা কথাটী বুঝেন না, অথচ পাণ্ডিত্যাভিমান রাখেন বড়ই দুঃখের কথা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব যে ভাবে নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন, অন্য শাস্ত্রে যদি অন্য দেবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সেই ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে, তবে তাহা তদীয় উপাসকগণের প্রকাশ্ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ-অবধারণে প্রকৃত ভাবে প্রবেশ অবশ্যই প্রার্থনীয়। অভীষ্ট দেবতাকে শাস্ত্রমতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া না বুঝিলে সেই দেবতার প্রতি মন কেমন মজিতে পারে না। সর্ব্ব-

দেবতায় একত্ব-মনন নিতান্ত স্থূল বুদ্ধির পরিচায়ক। শাস্ত্র-অনভিজ্ঞতাই এই-রূপ মত পোষণের কারণ। বিষ্ণুরহস্যে বর্ণিত হইয়াছে, সর্প, ব্যাঘ্র ও কুম্ভী-রের সহিত আলিঙ্গন ঘটে, তাহাও শ্রেয়, তথাপি "যেন বাসনারূপ শেলবিদ্ধ (দেবতান্তর-সেবা-বাসনা-বিশিষ্ট) নানা দেবোপাসকের সংসর্গ না ঘটে,

"আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্র-জলৌকসাং।

ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাং॥

হিন্দু-সমাজের দুরবস্থা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যথার্থ শাস্ত্র-জ্ঞানী এখন বড় দেখা যায় না। যে দুই একজন আছেন, অতত্ত্বজ্ঞের মধ্যে তাঁহারা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছেন না। একান্ত ম্রিয়মাণ অবস্থায় কোন প্রকারে দিন কাটাইতেছেন। প্রকৃত তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলে সমাজে এখন অনাদৃত, এমন কি নিতান্ত লাঞ্ছিত হইতে হয়। আর ধর্ম্মকথা, তত্ত্ব-কথা, শাস্ত্রকথা এখন কেই বা শোনে? পশুর মত উদর ভরণ এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণই এখন বর্ত্তমান সভ্যতার বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভক্তি-কথা এখন উপহাসের বিষয় হইয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে ধ্যান ধারণা সুদূরে পলায়ন করিয়াছে।

অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সমর্থন করিয়া বলিতেছেন,

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে।

আপনি পরব্রহ্ম, জীবের পরম আশ্রয় এবং পরম পবিত্র। দেবর্ষি নারদ এবং অসিত দেবল ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ আপনাকে ব্রহ্মাদি দেবগণের আদি-ভূত স্বপ্রকাশ বিভু বলিয়া থাকেন, আপনি স্বয়ংও আমাকে তাহাই বলিতেছেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি"

যাঁহা হইতে ভূত (দেব, মানবাদি) সকল জন্মগ্রহণ করে, যাঁহা দ্বারা জাত প্রাণি-সকল বাঁচিয়া থাকে এবং অন্তকালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে ব্রহ্ম

বলিয়া জানিবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অখিল জীবের আশ্রয়,

"ব্রহ্ম হতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥"

শ্রীচরিতামৃত বলেন,

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

শাস্ত্র বলেন,

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবং॥

যিনি ভগবান্ নারায়ণের সহিত ব্রহ্ম, রুদ্রাদি দেবতার সমত্ব জ্ঞান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই উপাসনা করিতে হইবে, তিনিই আরাধ্য, কিন্তু সাবধান, অন্য দেবতার প্রতি যেন কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না,

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"

পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণের ভিন্ন ভিন্ন প্রাপ্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন,

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

যাঁহারা দেবোপাসনা-পরায়ণ, তাঁহারা দেবলোক প্রাপ্ত হন, যাঁহারা পিতৃব্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-পরায়ণ) তাঁহারা পিতৃলোকে গমন করেন। যাঁহারা ভূতাদির পূজাতে রত, তাঁহারা ভূতলোক পাইয়া থাকেন। যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা (বৈষ্ণবগণ) আমাকেই প্রাপ্ত হন।

দেবব্রত-পরায়ণগণ দেবাদিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে পরিমিত ভোগান্তে দেবতাগণের বিনাশ-কালে নিজেরাও বিনষ্ট হন। দেবতাসকলও নশ্বর, দেবলোকও নাশশীল। সুতরাং দেবোপাসকগণ নশ্বর ফল প্রাপ্ত হন।

একমাত্র আমার ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণবগণ অনাদিনিধন, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বাধিক অসংখ্য কল্যাণ-গুণ-বিশিষ্ট আমাকে পাইয়া অতিশয় আনন্দ ভোগ,

করেন। তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয়না। তাঁহারা আমার দিব্যধামে বিলাস করিয়া থাকেন। আমি অনশ্বর ও নিত্য। আমার ভক্ত ও অনশ্বর ও নিত্য,

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে॥

আমার ভক্ত মহাপ্রলয়ে পুনরাবর্ত্তিত হয়না। যে খানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন হয়না, তাহাই আমার পরম ধাম। যে সময়ে ব্রহ্মা ও শঙ্করাদি কোন দেবতার বিদ্যমানতা থাকেনা, নারায়ণ তখনও বিদ্যমান থাকেন। তাঁহার ইচ্ছায় অন্যদেবতার উদ্ভব হয়।

"একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।

শ্রীভগবানের নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম, তাই ব্রহ্মার নাম কমল-যোনি। শঙ্কর ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে জাত হইয়াছেন।

শ্রীভগবানের আরাধনায় যে প্রাপ্তি, তাহা সীমা-শূন্য, ক্ষয়-রহিত এবং অনন্ত সুধা-মধুর-রস-ধারায় নিত্য প্রবাহিত। দেবতান্তরের পূজন-জনিত যে ফল, তাহা অতীব সামান্য, ক্ষয়শীল এবং সীমাবদ্ধ।

যদি বলা যায়, অন্য দেবতা-পূজকেরা শাস্ত্রবিধি-নির্দ্দিষ্ট নিয়মেই যখন সেই সেই দেবতার পূজা করেন, তখন তাহাতে দোষ কি? শাস্ত্রবিধি-মত যে পূজা, তাহা অবিধি-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত বলা যাইতে পারে না। এ কথা সত্য হইলেও তাঁহাদের সেই পূজা বিধিপূর্ব্বক বলিয়া পরিগৃহীত হইবার অযোগ্য। চরম এবং পরম ফল-দর্শনেই কর্ম্মের বিচার হয়। তাঁহারা শাস্ত্র-বিধি-অনুসারে অন্য দেবতার উপাসনা করিলেও সেই উপাসনার পরম ফল প্রাপ্ত হননা। সুতরাং অন্য দেবতার উপাসনা প্রকৃত বিধি-সঙ্গত, প্রাপ্য ফল সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ইহা বলা যায় না।

অন্য দেবোপাসকের ফল-প্রাপ্তি ঘটেনা এমন নহে, তবে সেই ফল অতি তুচ্ছ, সেই ফল নশ্বর। অন্যদেব-উপাসনায় ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি দূরের কথা, মুক্তি-লাভও ঘটেনা। শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কাহারও মুক্তি-দানের অধিকার নাই। তাঁহারা নিজেই ভগবৎচরণে মুক্তি-প্রার্থী।

গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকটীতে ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্যত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥

নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য দেবতার ভজন-পরায়ণ না হইয়া, আমাকেই ভজন করেন, তাহা হইলে তিনিও সাধুরূপে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। কেন না, তিনি উত্তম অধ্যবসায়শীল। শ্লোকের টীকায় শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, শৃণু মদ্ভক্তির্মাহাত্ম্যং সুদুরাচারোঽতীব কুৎসিতাচারোঽপি ভজতে মাং অনন্যভাক্ নান্যভক্তিঃ সন্, সাধুরেব সম্যগ্বৃত্ত এব স মন্তব্যঃ জ্ঞাতব্যঃ সম্যগ্ যথাবদ্ব্যবসিতো হি যস্মাৎ সাধুঃ নিশ্চয়ঃ সঃ

হনুমান বলিতেছেন, "অন্যং ন ভজতীত্যনন্যভাক্"। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন, "অনন্যভাক্ মত্তোঽন্যং দেবতান্তরং মত্তোঽন্যৎ কর্মজ্ঞানাদিকং মৎকামনাতোঽন্যাং রাজ্যাদিকামনাং ন ভজতে স সাধুঃ। সুদুরাচারং পরহিংসা-পরদারপরদ্রব্যাদি-গ্রহণ-পরায়ণোঽপি মাং ভজতে চেৎ।"

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

ভগবদ্ভক্ত ও ভক্তির অপরিসীম মাহাত্ম্য এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমার ভক্তভক্তির বশ্যতা রূপ যে স্বভাব, তাহা দুস্ত্যজ। আমি চিরকালই ভক্তিবশ। এই জন্যই আমি নিন্দিত ক্রীড়াশীল ভক্তগণের প্রতিও অনুরাগী হইয়া, তাঁহাদের উৎকর্ষ-সাধন-কারী-দেবতান্তর-ভজন-বিরহিত একমাত্র আমার প্রতি ভজন-নিরত, যদি কোন নিরতিশয়-নিন্দিত-কর্ম্মপরায়ণ জনও আমার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমাকে ভজন করে, তবেও সেই ব্যক্তিকে সাধু বলিয়াই জানিতে হইবে। যিনি আমি ভিন্ন অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করেন না, যিনি একান্ত মদেকনিষ্ঠ, যিনি আমাকে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত বলিয়া ভজন করেন, তাঁহারই এইরূপ সাধুত্ব কল্পিত হয়। সেই অসদাচারী ভজন-পরায়ণ ব্যক্তি আমার কল্পিত বিধিতে সাধু বলিয়াই সর্ব্বত্রই মাননীয় ও তদ্বার্ত্তায় অবশ্যই প্রত্যবায়ী হইবে না; যে হেতু, সেই ব্যক্তি আমার প্রতি একান্ত নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠতম পথ নিশ্চিত করিয়াছেন।

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,

"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ। ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।" সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরির প্রতি অনন্য-চেতা হন, তাহা হইলে পরম শোভাসম্পদে বিরাজিত হন। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন-হেতু চন্দ্রের কখনই তিমির-পরাভবতা ঘটেনা।

স্বভক্তের প্রতি আসক্তি আমার স্বাভাবিক। ভক্ত দুরাচার হইলেও আমার আসক্তি অপগত হয় না। তাঁহারও আমি উৎকর্ষ বিধান করি। পরহিংসা, পরদার ও পরদ্রব্যাদি গ্রহণপরায়ণ জনও যদি, দেবতান্তরের ভজনপরায়ণ না হইয়া, আমার ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া, আমার কামনা ব্যতীত রাজ্যসুখ-ভোগাদি জলাঞ্জলি দিয়া আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকেও সাধু বলিয়া জানিবে। এই স্থলে "মন্তব্য" এই বাক্যে বিধি সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ দুরাচার ভক্তকেও সাধু জ্ঞান করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হইবে। যদি বলা যায়, তোমার ভজন করে, এই জন্য সে ব্যক্তি অংশতঃ সাধু, কিন্তু সে ব্যক্তি পরদারপরায়ণ; এই জন্য অংশতঃ অসাধু। তদুত্তরে বলা হইতেছে, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবেই সাধু মনে করিবে। তাঁহার অসাধুত্ব কখনই দেখিবে না। কেন না, সে ব্যক্তির অধ্যবসায় বড়ই শোভন।

শ্রীভগবানের এই বাক্য আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে। সুক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে, সত্যই শ্রীভগবানের বাক্যে পরম সত্য নিহিত রহিয়াছে। যিনি শ্রীভগবদ্ভক্তি-পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অধিষ্ঠিত হইতেই হইবে। ভক্তির মনোহর আকর্ষণ।

ভক্তি-সাধন-বর্জ্জিত-পাণ্ডিত্যাভিমানী [illegible] সেই ব্যক্তিগণ সাধু) [illegible], মন ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে আদর ও অধিকৃত করিয়া থাকে। [illegible] তত্ত্ব আনন্দ-ভাবের প্রত্যাশায়, [illegible] উৎকণ্ঠিতচিত্তে থাকেন। সংসারের ঘৃণিত লালসা, বিষয়-ভোগের কামবিহ্বলতা [illegible] ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার বৃত্তার আপাততঃ মধুরতা ভক্তের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও হেয় বলিয়া

প্রতীয়মান হয়। সুতরাং পাপের ঘৃণিত ও নিন্দনীয় পথে বিচরণের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ তাঁহার তিরোহিত হইয়া যায়। লালসার কুৎসিৎ সঙ্কেতে অনুসরণ করিতে আর প্রবৃত্তি থাকে না। বিষয়োপভোগ-জনিত ক্ষণিক বিলাসে তাঁহার নয়ন-মন কখনই আর লালসিত হয় না। বস্তুতঃ ভক্তির মহিমা অপরিসীম। ইহা পরমোৎকর্ষ-বিধায়ক ও শ্রেষ্ঠতম ফলপ্রদ। পরশ্লোকেই এই ভাবটী স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটীতে কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির ও ভক্তের শ্রেষ্ঠত্বও ধ্বনিত হইয়াছে।

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে ভজন করিলে অচিরে ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া থাকেন। তদনন্তর চিরশান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হন না, ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল।

শঙ্করাচার্য্য—"প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু।

শ্রীধর—"কুতর্ক-কর্কশ-বাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি, হে কৌন্তেয়! পটহাদিমহা-ঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু"।

শ্রুতিতে দুরাচার ভক্তের ভগবদ্বিমুখতা বর্ণিত হইয়াছে। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"। উল্লিখিত স্থলে ভক্তি-গন্ধহীন স্বাভাবিক দুরাচারের বিষয় কথিত হইয়াছে। দুরাচারের মধ্যে যাঁহারা আমার প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন, তাঁহাদের দুর্বৃত্ততা অচিরকালের মধ্যেই বিধৌত হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ অনুতাপের উদয় হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হয়। যদি বলা যায়, স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে না, সুতরাং তাহাকে সাধু বলা যায় না। অতএব ভক্তানুরক্তি-পরবশ ভগবান যেন সকোপভাবে বলিতেছেন,—হে কৌন্তেয়! তুমি তাদৃশ তার্কিকগণের সভায় সগর্বে বলিবে যে, আমার একান্ত অনুগত ভ্রম-প্রযুক্ত দুরাচার হইলেও কখনও নষ্ট হয় না। স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থা-সমূহ আমার ভক্তগণের প্রতি প্রযুজ্য নহে। ভক্তসমক্ষ আমার ভক্তি

বিরহিত ব্যক্তিগণের নিমিত্তই বিহিত আর ঐ স্মৃতি-শাস্ত্রেই প্রায়শ্চিত্ত হইতেও আমার নামাদি স্মরণ প্রধানরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

যদি বলা যায়, তাদৃশ অধর্ম্মাচার-পরতন্ত্র ব্যক্তির সেবা তুমি কিরূপে গ্রহণ কর? কাম-ক্রোধাদির দ্বারা বিমলিনান্তঃকরণ ব্যক্তির নিবেদিত অন্ন-পানাদি তুমি কিরূপে ভোজন করিয়া থাক? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন, যে "শীঘ্রই সে ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা হয়।" এই স্থলে "ক্ষিপ্রম্" এই পদ দ্বারা ভাবী কাল সূচিত হইতেছে। সুতরাং "গমিষ্যসি" অর্থাৎ "প্রাপ্ত হইবে"। এই বর্ত্তমান পদ প্রয়োগে, বুঝা যাইতেছে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের পরই আমার ভজন-মার্গের অনুসরণে সেই ব্যক্তি আমাকেই প্রাপ্ত হয়। "হায়, হায়! আমার তুল্য ভক্ত-কুলে কলঙ্ক ও অধম আর নাই।" আমাকে ধিক্, এই প্রকার সেই ব্যক্তি নিরন্তর অনুতাপানলে দগ্ধীকৃত হয়। অথবা কিয়ৎক্ষণ পরই সেই ভক্ত ভাবী ধর্ম্মাত্মতা লাভ করেন, অসদাচরণের সময়ই সূক্ষ্মভাবে ধর্ম্মভাব তাহার হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, এই বিবেচনায়, বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াপদ সুসঙ্গত হইয়াছে। যেমন মহৌষধ-সেবনের ফলে, জ্বরদাহ বা বিষদাহ ক্রমশঃ হ্রাস হইলেও সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় না, অথচ প্রকোপ হ্রাস হওয়ায় কেহ তাহা গণ্যই করেন না, সেইরূপ ভক্তের দুরাচারত্ব-ব্যঞ্জক কাম-ক্রোধাদি বিষদন্ত-বিহীন সর্প-দংশনের ন্যায় একান্ত অকিঞ্চিৎকর, এই প্রকার ধ্বনি আসিতেছে। দুরাচারত্ব-দশায়ই ভক্ত পরম কৃতার্থ—এখানে এইভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ধর্ম্মাত্মাই হন, তবেত বিবাদের কোনই কারণ নাই। কিন্তু কোন কোন দুরাচার ভক্ত মৃত্যু-পর্য্যন্তও দুরাচারত্ব পরিত্যাগ করেন না, সেখানে কি বলা যাইবে? এই নিমিত্ত ভক্তবৎসল ভগবান নিতান্ত কুপিত হইয়া বলিতেছেন, প্রাণনাশেও আমার ভক্তের অধঃপতন হয় না। "কুতর্ক-কর্কশ-বাদিগণ ইহা মানিবে না" ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ শোক-সন্তাপাকুল অর্জ্জুনকে প্রোৎসাহিত করিতেছেন, হে কৌন্তেয়! তুমি ঢক্কা-পটহাদি-বাদন-পূর্ব্বক প্রতিপক্ষগণের সভায় বাহুদ্বয় উত্তোলিত করিয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে সদর্পে প্রতিজ্ঞা কর, যে, বাসুদেবের ভক্ত যদি দুরাচার হইলেও এবং প্রাণ-সঙ্কট দশায় নিপতিত হইলেও কখনই বিনষ্ট হন না। পরন্তু কৃতার্থই হইয়া থাকেন। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীভগবান্ কেন নিজে প্রতিজ্ঞা না করিয়া অর্জ্জুনকে

প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলেন না? শ্রীভগবান ত পূর্ব্বে একবার স্বয়ং অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন, "আমি অবশ্যই সর্ব্বপাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, যে হেতু তুমি আমার প্রিয়"। পূর্ব্বের মত এখনও ত বলিতে পারিতেন, "আমার ভক্তের বিনাশ নাই, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি"। এ কথা কেন বলিলেন না? শ্রীভগবান একণে নিজ মনে বিচার করিলেন, ভক্তবৎসল আমি নিজ ভক্তের অপকর্ষের লেশমাত্রও সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা খণ্ডন করিয়া নিজের অপকর্ষ স্বীকারে বহুস্থলেই ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া থাকি। যেমন ভীষ্ম-যুদ্ধে নিজের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিয়া ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা করিয়াছি। বিতণ্ডাপ্রিয় বহির্ম্মুখ-বাদিগণ আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হাস্য করিতে পারে। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পাষাণের রেখার মত তাহাদের প্রতীত হইবে। সুতরাং অর্জ্জুনের দ্বারাই প্রতিজ্ঞা করাইব।

নিম্নলিখিত ভগবদুক্তিতেও ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য এবং শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব ভক্ত-বৎসলতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

সকল ভূতের প্রতিই আমার সমভাব। আমার কিছুই দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তি-সহকারে আমার ভজন-নিরত, তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন। আমিও সেই সমস্ত ব্যক্তিতে অবস্থিত হই।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তগণকে বিমুক্তি-প্রদানে নিজকে প্রাপ্য করাইয়া অভক্তগণে দুষ্প্রাপ্য করায় তোমাতে কি বৈষম্য আছে? তাহা নহে; আমি সকলের প্রতিই সমান। শ্রীভগবান সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং সমগ্র জগৎ শ্রীভগবানে আছে; ইহাতে কোনও বিশেষত্ব না থাকিলেও যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করি, এই ন্যায়-অনুসারে শ্রীভগবান ভক্তের প্রতি অধিকতর আসক্ত হন। ভক্তের যে প্রকার ভগবানের প্রতি আসক্তি, ভগবানেরও তেমনই ভক্তের প্রতি আসক্তি দৃষ্ট হয়। এবিষয় কল্পবৃক্ষাদির দৃষ্টান্ত একাংশে বুঝিতে হইবে। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কল্পবৃক্ষের আশ্রিত হয়, তাহারা কল্পবৃক্ষের প্রতি আসক্ত এবং কল্পবৃক্ষও আশ্রিতগণের প্রতি আসক্ত হয় না। আশ্রিতের বৈরিগণকেও বধ করে না। ভগবান

কিন্তু স্বভক্তের বৈরিগণকে স্বহস্তে বধ করেন। ভক্ত-বাৎসল্য-রূপ বৈষম্য শ্রীভগবানে নিত্যই আছে। ইহা তাঁহার ভূষণই বটে, দূষণ নহে। শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য অতিশয়রূপে প্রসিদ্ধই আছে। জ্ঞানী-বাৎসল্য, যোগী-বাৎসল্য, বা অন্য দেবতার ভক্তের প্রতি বাৎসল্য তাঁহাতে দৃষ্ট হয় না। ইহ জগতে যেমন অপরের দাসের প্রতি বাৎসল্য দেখা যায় না, কিন্তু নিজ দাসের প্রতি বিশেষ বাৎসল্য দৃষ্ট হয়, শ্রীভগবানেরও তেমনই নিজ ভক্তের প্রতি অসাধারণ বাৎসল্য দেখা যায়। রুদ্র-ভক্ত বা দেবী-ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের বাৎসল্য কোথাও শুনা যায় না। শ্রীভগবান ভক্ত-ভক্তিমান, শ্রীভগবানের এই একটী অপূর্ব্ব স্বভাব।

সূর্য্য-দেবতা স্বচ্ছ-দর্পণাদিতে যেমন প্রতিবিম্বিত হয়, অস্বচ্ছ ঘট পটাদিতে তেমন নহে। এ জন্য দর্পণের প্রতি সূর্য্যের অনুরাগাধিক্য এবং ঘটের প্রতি তাঁহার অনুরাগের অভাব, এই কথা বলা যায় না। সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত শ্রীভগবান সুনির্ম্মল ভক্ত-চিত্তে যেরূপ অভিব্যক্ত হন, মলিন-চিত্ত অভক্তের হৃদয়ে তেমনভাবে প্রকাশিত হন না। ভক্তির গুণেই শ্রীভগবান আকর্ষিত হন, অন্যভাবে তাঁহাকে আকর্ষণ করা যায় না।

শ্রীভগবান্ সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন বটেন, কিন্তু ভক্তিরসে উদাসীন নহেন। বরং ভক্তিরসে তাঁহার সমধিক আকাঙ্ক্ষাই দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

মোক্ষফলত্যাগী সাধুগণ আমার হৃদয়। আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমি ভিন্ন অন্য জানে না, আমিও সাধুগণ ভিন্ন অন্য জানি না। সাধুগণ আমার হৃদয় ও আমি সাধুগণের হৃদয়—এইরূপ বলার তাৎপর্য্য—অগ্নি-মধ্যস্থ লৌহপিণ্ড যেমন আপন বর্ণ ও স্বভাব হারাইয়া অগ্নির স্বভাব পাইয়া থাকে, আমাতে অর্পিত সাধুগণের চিত্তও তেমনই তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাংই সাধুর হৃদয়ও আমি পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হই না। ভক্তের ভগবৎ-বিষয়ে ভক্তি এবং শ্রীভগবানের ভক্তিরস গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা দুইটীই সমভাবে আছে। তাহা না হইলে ভজনের কোন সার্থকতা থাকে না। শ্রীভগবানের হৃদয়ে ভক্তের

বাসনাটী প্রতিবিম্বিত হয়। ভক্তের বাসনার অনুরূপ তাঁহার হৃদয়ে অনুগ্রহ-ব্যঞ্জক বাসনা জাগিয়া থাকে। ভক্ত যদি মনে করেন, আমি শ্রীভগবানের গলায় বৈজয়ন্তী ফুলের মালা দোলাইয়া দিব, অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ মনে করেন, ভক্ত যদি আমাকে মালা ছড়াটী পরাইত, তবে বড়ই আনন্দিত হইতাম। ভক্তি-প্রিয় ভগবান্ ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য সর্ব্বদাই একান্ত লালায়িত। ভক্তির লেশমাত্র সন্দর্শনে শ্রীভগবান্ একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ ভক্তির যে অমূল্য উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। হায়! গীতা পাঠ করিয়াও যাঁহারা ভক্তি-বিমুখ হইয়া কর্ম্মজ্ঞানাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিশ্চিতই পরম দুর্ভাগা। আর এক শ্রেণীর দুর্ভাগা দেখা যায়, ইহাঁরা নিজ গৃহের অমূল্য রত্নের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিকে উপেক্ষা করেন, তাঁহারা আত্মঘাতী। এই পাপ-তাপ-পরিক্লিষ্ট সংসারে ভক্তিই পরম উপায়। ভক্তি-পথ অতি সহজ, সুকোমল ও আনন্দময়। মোহাচ্ছন্ন জনগণই জ্ঞান ও কর্ম্মাদিতে আসক্ত হইয়া থাকেন। ভক্তি সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা, অচিরে অজ্ঞান-অন্ধকার সম্যক্‌রূপে বিদূরিত করেন।

ইহজন্মে যিনি যতটুকু ভক্তি-ধনের অধিকারী হন, সেটুকু সংগৃহীত সম্পত্তি রূপে সংস্থিত হইয়া থাকে। জন্মান্তরে **সুদ-প্রস্থ রূপে** তিনি তাহা নিশ্চিতই লাভ করেন। ভরত-মহাশয় এবং প্রাহ্লাদপ্রমুখ এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ। ভক্তি-সাধনায় হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কিছুই নাই। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান জগতের প্রতি যে ভক্তি-উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি সেই পথে অগ্রসর না হই, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বতঃই বঞ্চিত বলিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত কতিপয় শ্লোকে ভক্তির প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে ভক্তি-সাধন-প্রণালী বলিতেছেন,

> "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি যুক্তৈঃ বমাত্মানাং মৎপরায়ণঃ।"

তুমি একান্তভাবে মদগতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদুপাসক হও এবং আমাকেই নমস্কার কর। মন্নিষ্ঠ হইয়া মনসংযোগ করিলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ ভক্তি ও অর্চ্চনার বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। প্রকারান্তরে কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির নিবারণ করিয়া ভক্তি-বিষয়ে প্রবৃত্তি জাগাইলেন। শ্লোকের তাৎপর্য্য—কেবল মদেকনিষ্ঠ হইলেই হইবে না। আমার ভক্ত হইতে এবং আমাকে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ভক্তি-সাধন ব্যতীত যে নিষ্ঠা, তাহা আমার প্রসন্নতা বিধান করিতে পারে না, ইহাও বলিলেন।

অনন্যা ভক্তি ব্যতীত শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই, সর্ব্বতোভাবেই ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীগীতার বহুতর শ্লোকেই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥"
"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥"
"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥"

কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা ও বৈরাগ্য প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধনে যাহা পাওয়া যায়, সেই সমস্তই ভক্তির দ্বারা অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে,

"যৎ কর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ॥

একমাত্র ভক্তিযোগে যাঁহারা নিরন্তর শ্রীভগবানকে উপাসনা করেন, শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে অচিরে দুস্তর মৃত্যুসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন,

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিত-চেতসাং ॥"

শ্রীভগবান্ অর্চ্চিরাদি-গতি ব্যতীতই ভক্তকে গরুড়-স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া পরম ধামে লইয়া থাকেন,

"নয়ামি পরমং স্থানং অর্চ্চিরাদি-গতিং বিনা।
গরুড়-স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ ॥"

"প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" গীতা, ভাগবতাদি-শাস্ত্রের সার কথা সহজ সরল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য দেব-দেবীর ভজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের মধুরতা গ্রন্থখানিতে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন,

"ভাগবত শাস্ত্র-মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই,
এই ভক্তি পরম ভজন॥
সাধু শাস্ত্র গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়ে ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহাকে করিবা ভিন
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাহে॥
অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি
কায়মনে করিব ভজন।
সাধু-সঙ্গ কৃষ্ণ-সেবা না পূজিব দেবী দেবা
এই ভক্তি পরম কারণ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমই পরম প্রার্থনীয়। ভক্ত প্রেম ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারেন না। মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।

জল ব্যতীত মৎস্য যেমন বাঁচিতে পারে না, ছটফট করিয়া মরিয়া যায়, ভক্তও প্রেম ব্যতীত তেমনই বাঁচিতে চাহেনা। এই কৃষ্ণ-প্রেম বড়ই দুর্ল্লভ। এই জন্য প্রেমের একটী নাম সুদুর্ল্লভ। কৃষ্ণপ্রেম, জাম্বুনদ-স্বর্ণ অপেক্ষাও অতিশয় মনোহর। এই প্রেম যদি কোন ভাগ্যে লাভ হয়, তবে আর ইহার বিয়োগ ঘটে না। গুর্ব্ববজ্ঞা ও ভক্তের নিকট অপরাধের ফলে যদি দৈবাৎ এই প্রেম হইতে বঞ্চিত হয়, তবে ভক্ত আর বাঁচে না,

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।

যদি হয় তার যোগ কভু না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না বাঁচয়॥

পিপাসায় বক্ষ ফাটিয়া গেলেও চাতক যেমন অন্য জল কখনই পান করে না কেবল মেঘের পানেই তাকাইয়া থাকে, তেমনই প্রকৃত ভক্তও কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদিকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রেমভক্তির প্রতিই অনুরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। নব-বিকশিত প্রভাত-কমলের মধুর অমল শোভায় মধুকর যেমন বিমুগ্ধ হয়, মধুপানে গুণ গুণ স্বরে গান করে, ভক্তও তেমনই নীল-কমলের মকরন্দপানে পুলকিত হইয়া থাকেন। নিরন্তর ভগবৎ-গুণ-গানে বিমুগ্ধ হন। চকোর যেমন চন্দ্রিকার শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হয়, ভক্তও তেমনই ভক্তিচন্দ্রিকায় একান্ত উন্মাদিত হইয়া থাকেন। পতিব্রতা রমণী যেমন প্রাণ-পতির সেবা করেন, ভক্তও তেমনই অন্য দেব-উপাসনার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনায় তৎপর হইয়া থাকেন। ভক্তিতে তাঁহার হৃদয়-মন পুলকিত হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন সঞ্চিত ধনের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হয়, ভক্তও তেমনই প্রেমের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকেন।

হায়! গরলময় বিষয়-বিষ অমৃত বলিয়া পান করিলাম, দুঃখকে সুখ বলিয়া মানিলাম, প্রাকৃত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত গোবিন্দ-বিষয়-রস আস্বাদন ভাগ্যে ঘটিল না। তাঁহার দাসের দাস হইলাম না, উপায় কি হইবে?

দেখিতে দেখিতে ত জীবন কাটিয়া গেল, শিয়রে মৃত্যু উপস্থিত। এখনও ত সুবুদ্ধির উদয় হইল না। বুঝিলাম, আরও বহু জন্মই আমায় আসিতে যাইতে হইবে।

হায়রে! অভিমানে আত্মহারা হইয়া দিন কাটাইলাম, কাজেই ভক্তির রস-আস্বাদনে বঞ্চিত হইলাম। আমার মত দুর্ভাগা আর জগতে নাই।

হায়! হায়! পরম-ভক্তবৎসল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলাম না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সুহৃৎ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ বিনে পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবৎসলতা, কৃতজ্ঞতা, সৌহৃদ্য ও বদান্যতার সীমা নাই, কিন্তু আমি এমনই দারুণ দুর্ভাগা, অনন্তগুণের নিধি পরম-দয়ালু-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রকে ভজন করিলাম না।

পূতনার সদ্গতি-দান-লীলাটীতে শ্রীকৃষ্ণের উপরোক্ত গুণ-সমূহ পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ভক্তবশ্যতার মধুরতার সুন্দর পরিচয়ও এই ঘটনাটীতে পাওয়া যায়।

পূতনা, শ্রীকৃষ্ণকে হননেচ্ছায় বিষলিপ্ত স্তন প্রদান করিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শ্রীগোকুলের প্রকাশ-বিশেষ শ্রীগোলোক-ধামে পাঠাইলেন। ধাত্রীগতি প্রদান করিলেন। কেবল মাত্র সদ্বেশ-ধারণের গুণ গ্রহণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে উত্তম-গতি প্রদান করিয়াছেন। অল্প মাত্র ভক্তির আভাসেও যিনি বিদ্বেষীকেও এমন কৃপা করেন, তাঁহার মত ভক্তবৎসল ও কৃতজ্ঞ আর কে আছেন? শত্রুর প্রতিও যাঁহার এইরূপ অসাধারণ করুণা, তাঁহার মত সুহৃৎ জগতে আর নাই। যিনি শত্রুকে সেবা পর্য্যন্ত দান করেন, তাঁহার মত বদান্য আর কে আছেন?

"পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাসনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং ॥
"রাক্ষসী পূতনা—শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বর বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া ॥
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালুরে ॥
"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রভুর উক্তি
"পূতনারে যেই প্রভু কৈল মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক অন্য করে ধ্যান ॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন ॥

যে কৃষ্ণের নামে হয় জগৎ পবিত্র।
না বোলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্য গীত করয়ে মঙ্গল॥
অজামিল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন কুল বিদ্যামদে তাহা নাহি জানে।
শুন ভাই সব সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধন॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথা কথনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥
করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগৎ-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দ-গোপের নন্দন॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
হেন কৃষ্ণ নামে যাঁর নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। একদিন তিনি ভক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"ভক্তি নাই কলিযুগে আর আছে কি?
ভক্তি আছে কলিযুগে তেই বেঁচে আছি॥

অনায়াসে মৃত্যু এবং দৈন্য-হীন জীবন ভক্তিরই ফলে হইয়া থাকে।

"অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় নহে বিদ্যা ধনে॥

কৃষ্ণ কৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা কুল, কোটি কোটি ধন॥

ভক্তির ফলে ভক্তের গৃহে কখনও কোন বিপদ আসেনা,

"যে তোমার চরণ কমল সেবা করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত দেখিলেই নমস্কার করিতেন। ভক্তের আশীর্ব্বাদে কৃষ্ণভক্তি, লাভ হইয়া থাকে,

"শ্রীবাসাদি দেখিলেই করেন নমস্কার॥
ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণতে ভক্তি হয়॥

শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠের ফল, কৃষ্ণভক্তি লাভ, যদি তাহা না হয়, তবে বিদ্যা শিক্ষার সার্থকতা নাই,

পড়ে কেনে লোক? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?

মহাপ্রভু বলিয়াছেন, যে শাস্ত্রে হরিভক্তি দৃষ্ট হয়না, স্বয়ং ব্রহ্মা বর্ণনা করিলেও তাহা শুনিতে নাই,

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শচী-দেবীর প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি,

"সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণ চন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণ-ভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্রে পাষণ্ডত্ব পায়॥
চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎ পথে চলে॥

শ্রীমহাপ্রভু জননীকে কৃষ্ণ-ভক্তির উপদেশ প্রদান করিতেছেন,

"শুন শুন মাতা! ভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ॥

কৃষ্ণের সেবক মাতা কভু নহে নাশ।
কালচক্র ডরা যেন দেখি কৃষ্ণ দাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে॥

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত জীবের দুর্গতি নাশ হয়না। বারম্বার জন্ম এবং বারম্বার মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। গর্ভে জীবের কি ভীষণ কষ্ট, মহাপ্রভু তাহা কপিলের ভাবে জননীকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু মাতৃ চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন,

"চিত্ত দিয়া শুন মাতা। জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুন পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব-অঙ্গে অমেধ্য পঙ্কের পরকাশ॥
কটু অম্ল লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার মহামোহ পায়॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমি-কুলে বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পরে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুন উৎপত্তি প্রলয়॥

জ্ঞান ও কর্ম্মাদি দ্বারা পূর্ণরূপে ভগবৎ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না। একমাত্র ভক্তি-সাধনেই পূর্ণতমরূপে ভগবৎ তত্ত্বের অনুভব হইয়া থাকে,

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপে।

জ্ঞান-যোগী ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত মুক্তিলাভের অধিকারী হন না। ভক্ত কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন,

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

মুক্তি সর্ব্বদাই ভক্তকে সেবা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভক্ত মুক্তি চান না। শ্রীভগবান তাঁহাকে মুক্তি দিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না,

"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"॥

প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ শ্রীভগবৎ-বিষয়ক ভক্তি, পাপ-রাশিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,

"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

তথা মদ্বিষয়াভক্তি রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

ভক্তের কৃপায় ভক্তি-লাভ ঘটিলে জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন,

"ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হইতে করে আকর্ষণ।

দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥

ব্যাস-দেবের কৃপায় নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত-চিত্ত শ্রীশুক-দেব গোস্বামী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়াছেন। সনকাদিও পরিণামে ভক্তির ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নারদ-ঋষির সঙ্গ-গুণে শৌনকাদি ঋষিগণ যোগ-সাধনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিয়াছেন,

"নারদের সঙ্গে শৌনকাদি ঋষিগণ।

মুমুক্ষা ছাড়িয়া ভজে কৃষ্ণের চরণ॥

ভক্তির-ফলে ভক্ত সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হন। কৃষ্ণ-সেবা-জনিত পূর্ণানন্দে ভক্ত-সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন। তাঁহার অন্য কোন বাঞ্ছাই থাকে না,

"কৃষ্ণভক্ত দুঃখ-হীন বাঞ্ছান্তর-হীন।

কৃষ্ণ-প্রেম সেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ॥

ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মলোকের সুখকে তৃণতুল্য মনে করেন,

"কৃষ্ণ পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়।

ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥

অপার করুণা-পারাবার শ্রীমন্মহাপ্রভু খোলা-বেচা শ্রীধরকে অষ্ট-সিদ্ধি দিতে চাহিলেন, শ্রীধর তাহা গ্রহণ করিলেন না—কাতর প্রাণে প্রভুর চরণে ভক্তি প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীধর ভক্তি-যোগের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন,

ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥
ভক্তি-যোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তি-বশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যার মনে।
সে তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলা আপনে॥

বৈষ্ণবের তত্ত্ব বড়ই দুর্জ্ঞেয়। ধনাভাব, জনাভাব, পাণ্ডিত্যের অভাব দেখিয়া অনেকে বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, বৈষ্ণবের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না,

"ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিব এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
"বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখিতে দুর্গতি॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদ অন্ধে সব এ কর্ম্ম না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

ভক্তি নিত্য। সর্ব্বযুগেই ইহার সমান আদর। ভক্তির নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অহৈতুকী-ভক্তি সর্ব্বপ্রকার ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠতম।

ভক্তি অর্থাৎ অনন্তপ্রকার ভোগ-বাসনা, অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও পঞ্চপ্রকার মুক্তি কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে ভক্তি-সাধন, তাহাকেই অহৈতুকী বলে। কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ এই অহৈতুকী ভক্তিতেই সর্ব্বতোভাবে ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্র ভক্তি-লাভের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা অর্থে শাস্ত্র-বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস। অনেক ক্ষেত্রেই ইহার পূর্ণ অভাব। শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস না হইলে ভক্তি-লাভ হইতে পারে না। শ্রদ্ধার পর, সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অবশ্যই হয়। ইহাই (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি) সাধন-ভক্তি। সাধন-ভক্তির ফলে সর্ব্বপ্রকার অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অনর্থ-

নিবৃত্তির পর নিষ্ঠা। নিষ্ঠা-শব্দের অর্থ বারম্বার আগ্রহের সহিত ভজন। নিষ্ঠার পর রুচি। ভজনে চিত্ত আবেশিত হইলেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি হইয়া থাকে। রুচির ফলে শ্রীভগবানে আসক্তি জন্মে। আসক্তির পর শ্রীকৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর উপজাত হয়। এই অঙ্কুর গাঢ় হইলেই তাহাকে প্রেম বলে। প্রেমের ফলে সর্ব্বানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সাধনদ্বারা পাপ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু পাপবীজ বিনষ্ট হয় না। পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত করায়—এইরূপ পাপবীজ হৃদয়ে সংলগ্ন থাকে। তাহা না হইলে পুনরায় জীব পাপে প্রবৃত্ত হইবে কেন? হৃদয়স্থ পাপবীজই পুনরায় অঙ্কুরোৎপাদন করে। সমূলে পাপবীজ ক্ষয় একমাত্র ভক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে। ইহা আবার ভক্তির গৌণ ফল। ভক্তির মুখ্য ফল শ্রীবৃন্দাবনে যুগল-কিশোরের নিত্য সেবা-প্রাপ্তি।

যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহাদিগের অপ্রারব্ধ ফল, কূট, বীজ ও ফলোন্মুখ এই পাপ চতুষ্টয় ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যিনি ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার গুণে ত্রিজগৎ পরিতৃপ্ত। জঙ্গম এমন কি স্থাবরও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়,

"যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তব স্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥"

যাঁহার শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দে ভক্তি হয়, ঐ ভক্তি তাঁহাকে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, বিষয়-ভোগরূপ ভুক্তি-সুখ, ব্রহ্মসুখ এবং পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ অনুভব করাইয়া থাকেন,

"সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তি মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ॥"

ভক্তবর প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রভো! আমার ভক্তি যেন তোমার চরণে সুদৃঢ়া হয়। এই ভক্তিলতা বড়ই সুখদা। ঈশ্বরানুভবরূপ আনন্দ-প্রদায়িনী। মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল।

যাঁহার হৃদয়ে অণুমাত্রও ভক্তি আবির্ভূত হয়, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও

মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন। এই জন্য ভক্তির একটী নাম মোক্ষলঘুতাকারিণী।

চেটিকা অর্থাৎ দাসীগণ ভীতচিত্তে যেমন রাণীর পশ্চাৎ গমন করে, তেমনই কর্ম্ম সাধ্য ভুক্তি, জ্ঞান-সাধ্য মুক্তি ও যোগ-সাধ্য সিদ্ধি প্রভৃতি হরিভক্তির পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিয়া থাকেন,

"হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বমুক্ত্যাদি-সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥"

এই শ্লোকটীতে কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যদি ব্রহ্মানন্দ-সুখকে দ্বিপরার্দ্ধ সংখ্যাদ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মানন্দ-সুখ ভক্তি-সুখ-সাগরের পরমাণুবৎ তুল্য হইতে পারে না, এই জন্য ভক্তির একটী নাম সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা।

ব্রহ্মানন্দো ভবদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুল্যমপি॥

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন, আমি আপনার দর্শনে বিশুদ্ধ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, ব্রহ্মানন্দসুখ আমার গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে।

অভক্তগণ ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারে না। ভগবচ্চরণারবিন্দই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহারাই ভক্তিরসটী আস্বাদন করেন।

ভগবৎ-পাদপদ্মের তুলসীর-সৌরভ, পুণ্য-পর্ব্বত, শঙ্খ ধ্বনি, পবিত্র-বন, সিদ্ধ-ক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়-ক্ষয়, মৃত্যু-চিন্তা ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের দর্শনে ভক্তির উদ্দীপন হয়।

যিনি ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরের শাসনকর্ত্তা হইয়াও মস্তকে উগ্রসেনের শাসন বহন করেন, যিনি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়াও সমুদ্রের নিকট যৎকিঞ্চিৎ ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং যিনি বিজ্ঞান-সমুদ্র হইয়াও উদ্ধবের নিকট রাজকার্য্যে মন্ত্রণা গ্রহণ করেন, সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে ভক্তি করাই জীবনের সফলতা।

হায়! এ হেন দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়া গুণের নিধি শ্রীকৃষ্ণ ভজিলাম না। জানিয়া শুনিয়াও বিষয়-বিষ সর্ব্বদাই ভক্ষণ করিতেছি, আমার উপায় কি হইবে?

হরি! হরি! বিফলে জনম গোঁয়াইনু।
মনুষ্য জনম পাঞা, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥

ভক্তি সমস্ত দুঃখকে পরাজয় করিয়া অপার সুখ প্রদান করেন। তক্ষক নাগ হইতে গুরুতর ভয় সসাগরা ধরার অধিকারচ্যুতি এবং অনশনব্রত এই সমস্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে কষ্ট প্রদান করে নাই। এই সমস্ত দুঃখকেও পরীক্ষিত ভক্তির প্রভাবে সুখ বলিয়া ভাবিয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্ন ভক্তি-বলে ক্রোধশীল ত্রিপুরারিকেও জয় করিয়াছিলেন। পত্নী প্রভাবতীকে প্রদ্যুম্ন বলিয়াছেন,—আকাশে কৃপাসাগর গরুড়ারূঢ় যদুপতিকে সন্দর্শন কর। ইনি আমাদের পরম গুরু। ইহাঁর সমীপে কোন অনির্ব্বচনীয় লালন প্রাপ্ত হইয়া দর্পের সহিত আমি গুরুতর রোষশালী মৃত্যুঞ্জয়কেও তিরস্কার করিয়াছি। প্রদ্যুম্ন ভক্তির ফলে যখন মৃত্যুঞ্জয়কেও জয় করিয়াছিলেন, তখন মৃত্যুকে জয় করা ভক্তের নিকট অতি তুচ্ছ কথা। ঠাকুর-মহাশয় প্রেমে গদ গদ হইয়া বলিয়াছেন,

"গোরা দ্বিজ নটরাজে, বাঁধহ হৃদয় মাঝে
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাসে কয়, গোরা সম কেহ নয়,
না ভজিতে দেন প্রেমধন॥"

প্রেমদাতা-শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণে প্রেম-লাভের প্রার্থনা করিয়া এখানেই গ্রন্থ পরিসমাপ্তি করিতেছি। অপার করুণাসিন্ধু অপাত্ত-জনার বন্ধু শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করুন, প্রার্থনা। এই মুহূর্ত্তেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি ত তুচ্ছ কথা, ব্রাহ্ম-সুখ, এমন কি বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের সুখও যদি আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাও প্রার্থনা করি না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে একমাত্র শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর শ্রীচরণ-কমলের দাসীত্বই প্রার্থনা করি। এতদ্ব্যতীত ত্রিজগতে অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া তন্মধ্যেও আবার রাগানুগা-ভক্তির উৎকর্ষ যিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন, নিজে এই ভক্তিরসটী আস্বাদন করিয়া যিনি জীবমাত্রকে নির্ব্বিচারে আস্বাদন করাইয়াছেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ-